সূচীপত্র

ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন	৫	ইসলামী নেতৃত্বের সংজ্ঞা	৫৬
আন্দোলনের অর্থ ও সংজ্ঞা	৫	ইসলামী নেতৃত্বের প্রক্রিয়া	৫৮
ইসলামের অর্থ ও সংজ্ঞা	৫	হাদীসে রাসূলের আলোকে নেতৃত্বের গুণাবলী	৬৮
ইসলাম ও আন্দোলন	৬	ঐ বাঞ্ছিত গুণাবাবলী অর্জনের উপায়	৭৪
ইসলামী আন্দোলনের পরিধি	৭	নেতৃত্বের মৌলিক দায়িত্ব	৭৫
দাওয়াত ইল্লাল্লাহ	৮	নেতা ও কর্মীর সম্পর্ক	৭৭
শাহাদাত আলান্নাস	১২	আনুগত্য	৭৮
কিতাল ফিসাবিলিল্লাহ	১৩	আনুগত্য কাকে বলে	৭৮
ইকামাতে দ্বীন	১৫	ইসলামের সাথে আনুগত্যের সম্পর্ক	৭৯
আমর বিল মারুফ ও নেহি আনেল মুনকার	১৮	আনুগত্যের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা	৭৯
ইসলামী আন্দোলনের শরয়ী মর্যাদা	১৮	আনুগত্যহীনতার পরিণাম	৮২
ইসলামী আন্দোলনের কাজ আল্লাহর কাজ	২০	আনুগত্যের দাবী	৮৫
এ কাজে শরীক হওয়ার জন্যেও আল্লাহর অনুমোদন প্রয়োজন	২৪	আনুগত্যের পূর্ব শর্ত	৮৬
ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্যে একটি সতর্কবাণী	২৬	ওজর পেশ করা গুনাহ	৮৭
ইসলামী আন্দোলনের সাফল্য	৩০	আনুগত্যের পথে অন্তরায় কি কি	৯০
জাগতিক সাফল্যের কোরআনিক শর্তাবলী	৩৫	আনুগত্যের পরিবেশ সৃষ্টির রূহানী উপকরণ	৯৪
ইসলামী সংগঠন	৪০	পরামর্শ	৯৬
সংগঠনের অর্থ ও সংজ্ঞা	৪০	পরামর্শের গুরুত্ব সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস	৯৭
সংগঠনের উপাদান	৪৮	পরামর্শ কারা দেবে	৯৮
ইসলামী সংগঠনের প্রকৃত মডেল	৪৯	পরামর্শ কিভাবে দেবে	১০০
ইসলামী সংগঠনের কার্যক্রম ও শরয়ী মর্যাদা	৫০	সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা	১০২
ইসলামী সংগঠনের নেতৃত্বের শরয়ী মর্যাদা	৫১	এক : ব্যক্তিগত এহতেসাব বা আত্মসমালোচনা	১০৪
ইসলামী সংগঠনের সিদ্ধান্তসমূহের শরয়ী মর্যাদা	৫২	ব্যক্তিগত এহতেসাবের পদ্ধতি	১০৪
আদর্শ ভিত্তিক ও গণমুখী নেতৃত্বের গুরুত্ব	৫২	দুই : পারস্পরিক মুহাসাবা	১০৭
		তিন: সাংগঠনিক কাজের মুহাসাবা	১১০
		সাংগঠনিক মুহাসাবার উপায়	১১১

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন

আন্দোলনের অর্থ ও সংজ্ঞা ঃ

আন্দোলন, movement এবং حركت (হারাকাতুন) এখন একটা রাজনৈতিক পরিভাষা হিসাবেই প্রচলিত। যার সাধারণ অর্থ কোন দাবী-দাওয়া প্রতিষ্ঠার জন্য এবং কোন কিছু রদ বা বাতিল করার জন্যে কিছু লোকের সংঘবদ্ধ নড়াচড়া বা উদ্যোগ গ্রহণ করা। এর ব্যাপক ও সামগ্রীক রূপ হল প্রতিষ্ঠিত কোন কিছুকে অপসারণ করে সেখানে নতুন কিছু কায়েম বা চালু করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা, প্রাণান্তকর চেষ্টা। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ হল একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তন করে অন্য একটা ব্যবস্থা কায়েমের চেষ্টা করা। নিছক ক্ষমতার হাত বদলের প্রচেষ্টাও আন্দোলন হিসাবেই পরিচিত হয়ে আসছে। আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটা দেশের প্রতিষ্ঠিত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত সংঘবদ্ধ ও সুসংগঠিত প্রচেষ্টাই সত্যিকার অর্থে আন্দোলন নামে অভিহিত হতে পারে।

এভাবে আমরা এক কথায় বলতে পারি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে পরিচালিত সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা বা সংগ্রাম সাধনার নামই আন্দোলন।

ইসলামের অর্থ ও সংজ্ঞা ঃ

ইসলাম শব্দের অর্থ আনুগত্য করা, কোন কিছু মাথা পেতে নেওয়া। ইসলাম শব্দের মূল ধাতু سلم এর অর্থ আবার শান্তি এবং সন্ধি। পারিভাষিক অর্থে একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত জীবন পদ্ধতি অনুসরণ করা এবং এর বিপরীত সমস্ত মত ও পথ পরিহার করে চলাকেই বলা হয় ইসলাম। মানুষের ইহকালীন শান্তি এবং পরকালীন মুক্তির এটাই একমাত্র সনদ। মূলত ঃ মানুষ ইসলামী আদর্শ কবুলের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সাথে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়- কোরআনের ভাষায়

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰي مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ

সন্দেহ নেই আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের জান ও মাল বেহেশতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন, এখন তাদের একমাত্র কাজ হল আল্লাহর পথে লড়াই করা, সংগ্রাম করা। পরিণামে জীবন দেওয়া বা জীবন নেওয়া। আত্ তাওবা ঃ ১১১

সিলমুন অর্থ শান্তি। কিন্তু সে শান্তি নিছক নীতি কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় কিংবা নয় নিছক কিছু শান্তিমূলক উপদেশবাণীর মধ্যেও সীমাবদ্ধ। ইসলাম শান্তি এই অর্থে যে, মানুষের জীবন ও সমাজের সর্বত্র অশান্তি বিরাজ করছে ইসলাম না থাকার কারণে। অন্য কথায় আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামীর পরিবর্তে মানুষ মানুষের দাসত্ব ও গোলামীতে নিমজ্জিত আছে বলেই মানুষের সমাজে অশান্তির আগুন জ্বলছে। সর্বশক্তি নিয়োগ করে, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে মানুষের সমাজকে এই অশান্তির কবল থেকে মুক্ত করার জোর তাগিদ ইসলামে রয়েছে বলেই ইসলাম শান্তির বাহক। এই শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক দাবী অনুসারে ইসলামকে শক্তির অধিকারী হওয়া একান্তই অপরিহার্য। এভাবে ইসলামের নিজস্ব পরিচয়ের মাঝে মানুষের সমাজে একটা আমূল পরিবর্তন ঘটাবার ও উলট পালট করার উপাদান নিহিত রয়েছে।

ইসলাম মানুষের জন্য একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সর্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভই তার অন্তর্নিহিত দাবী। সুতরাং ইসলাম একটা পূর্ণাঙ্গ আন্দোলনও বটে। মানব সমাজকে মানুষের প্রভুত্বের যাঁতাকল থেকে মুক্ত করে আল্লাহর প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে মানুষকে সুখী সুন্দর জীবন যাপনের সুযোগ করে দেওয়াই ইসলাম। কাজেই মানুষের প্রকৃত শান্তি, মুক্তি ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনই ইসলাম। এই শাশ্বত সত্যটি বাস্তবে উপলব্ধি করতে পারলে যে কোন ব্যক্তিই বলবে ইসলাম মূলতই একটি আন্দোলন। বরং আন্দোলনের সঠিক সংজ্ঞার আলোকে ইসলামই একমাত্র সার্থক ও সর্বাত্মক আন্দোলন।

ইসলাম ও আন্দোলন ঃ

আমরা এ পর্যন্ত ইসলামের অর্থ ও সংজ্ঞা প্রসঙ্গে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম তার আলোকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আন্দোলন, সংগ্রাম, বিপ্লব প্রভৃতি শব্দ আজ ইসলামের আলোচনায় বা জ্ঞান গবেষণায় নতুন করে আমদানী করা হয়নি। ইসলামের মূল প্রাণসত্তার সাথে এই শব্দগুলো ওতপ্রোতভাবেই জড়িয়ে আছে। আল কোরআন ইসলামকে আদ্বীন হিসাবে (অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ জীবন

বিধান) ঘোষণা করেই শেষ করেনি। বরং সেই সাথে এ ঘোষণাও দিয়েছে, এ দ্বীন এসেছে তার বিপরীত সমস্ত দ্বীন বা মত ও পথের উপর বিজয়ী হবার জন্যেই। (- আত্ তাওবা- ৩৩, আল ফাতহ - ২৮, আস সাফ্-৯)

(لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ)

কোন বিপরীত শক্তির উপর বিজয়ী হবার স্বাভাবিক দাবীই হলো একটা সর্বাত্মক আন্দোলন, একটা প্রাণান্তকর সংগ্রাম, একটা সার্বিক বিপ্লবী পদক্ষেপ। এ কারণেই আল কোরআনে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকে ঈমানের অনিবার্য দাবী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর হাদিসে বলা হয়েছে,

اَلْجِهَادُ مَاضٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

আল্লাহর পথে জিহাদ বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে হবে।

ইসলামী আন্দোলনের পরিধি ঃ

আমরা আন্দোলন বলতে যা বুঝে থাকি তার আরবী প্রতিশব্দ اَلْحَرَكَةُ। এ জন্যেই আধুনিক আরবী ভাষায় ইসলামী আন্দোলনের প্রতিশব্দ হল الحركة الاسلامية। কিন্তু আল কোরআনের এ ক্ষেত্রে একটা নিজস্ব পরিভাষা আছে। সেই পরিভাষাটি হলো الجهاد فى سبيل الله বা আল্লাহর পথে জিহাদ। حركة শব্দের মাধ্যমে আন্দোলন, সংগ্রাম বা চেষ্টা সাধনার যে ভাব ফুটে ওঠে, জিহাদ শব্দটা সে তুলনায় আরও অনেক ব্যাপক ও গভীর অর্থ বহন করে। আরবী ভাষায় جهد শব্দটাই জিহাদের মূল ধাতু। جهد অর্থ যথাসাধ্য চেষ্টা সাধনা, চূড়ান্ত প্রচেষ্টা, প্রাণান্তকর সাধনা প্রভৃতি। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ অর্থ আল্লাহর পথে চূড়ান্ত ও প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো।

আল্লাহর পথ কি? দুনিয়ায় মানুষের জীবন যাপনের জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে পথ ও পন্থা নবী রাসুলদের মাধ্যমে নির্ধারণ করে দিয়েছেন আল্লাহর পথ বলতে সেটাকেই বুঝায়। এই পথে জিহাদ বা চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালানোর অর্থ এই পন্থা ও পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। যেখানে এ পদ্ধতি অনুসরণের সুযোগ নেই, সেখানে এমন সুযোগ সৃষ্টির জন্যে সংগ্রাম করা।

জিহাদ শব্দের অর্থের ব্যাপকতার আলোকে আমরা আল কোরআনের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে আন্দোলন, সংগ্রাম বা বিপ্লব প্রভৃতি শব্দের ভাবার্থ বুঝতে চেষ্টা করলে দেখতে পাই এর কোন একটির মাধ্যমেও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর পুরো অর্থ প্রকাশ করা বা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। আল কোরআন দ্বীন প্রতিষ্ঠার গোটা প্রচেষ্টার বিভিন্নমুখী কার্যক্রম এবং প্রতিষ্ঠা লাভের পর তার হেফাযতের উদ্দেশ্যে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ এই সব কিছুকেই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর মধ্যে শামিল করেছে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার সূচনা থেকে সাফল্য লাভ পর্যন্ত এবং সাফল্যের পরবর্তী করণীয় বিষয়ে যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয় সেসবের অর্থ এবং তাৎপর্য বুঝলে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বা ইসলামী আন্দোলনের পরিধির ব্যাপক রূপ সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা লাভ করা সহজ হয়ে যায়।

আমাদের সমাজে সাধারণত জিহাদকে যুদ্ধ বা যুদ্ধকেই জিহাদ মনে করা হয়ে থাকে। অথচ এটা জিহাদের একটা অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত ব্যাপার হল যুদ্ধ জিহাদের একটা অংশ মাত্র। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর সূচনা হয় মানব জাতির প্রতি আল্লাহর দাসত্ব কবুলের আহ্বান জানানোর মাধ্যমে।

সহজ সরল ও দরদপূর্ণ ভাষায় মানব জাতিকে আল্লাহর দ্বীন কবুলের আহ্বান, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব গ্রহণ এবং গায়রুল্লাহর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব বর্জনের আহ্বানই এক পর্যায়ে কায়েমী স্বার্থের সাথে সংঘাত-সংঘর্ষে নিয়ে যায়। তাই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজে অংশ গ্রহণকারীকে বাতিল শক্তির সাথে যুদ্ধেও লিপ্ত হতে হয়। এই যুদ্ধ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর গোটা কার্যক্রমের একটা বিশেষ দিক বৈ আর কিছুই নয়। আল কোরআনের আলোকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর অন্তর্ভুক্ত কাজগুলোকে মোটামুটি ৫টি ভাগে ভাগ করা যায় : (১) দাওয়াত ইলাল্লাহ (২) শাহাদাত আলান্নাস (৩) কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ (৪) একামাতে দ্বীন (৫) আমর বিল মারুফ ও নেহী আনিল মুনকার। এই পাঁচটি কার্যক্রমের সমষ্টির নামই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বা ইসলামী আন্দোলন। সুতরাং ইসলামী আন্দোলনের কোরআনী পরিচয় জানতে হলে উল্লেখিত পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা লাভ করা একান্তই অপরিহার্য।

(১) দাওয়াত ইলাল্লাহ

মানুষের জীবনে ও আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আল্লাহর নির্দেশে নবী রাসূলদের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়েছে। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ পর্যন্ত সব নবীর আন্দোলনের সূচনা হয়েছে দাওয়াতের

মাধ্যমে। আল কোরআন বিভিন্ন নবীর আন্দোলন প্রসঙ্গে ঘোষণা করছে :

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ.

আমি নূহ (আঃ)-কে তাঁর কওমের নিকট পাঠিয়েছিলাম। তিনি তাঁর কওমকে ডাক দিয়ে বললেন, হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর- আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ বা প্রভু নেই। আল আরাফ ঃ ৫৯

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ.

এবং আদ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই হুদ (আঃ) কে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বললেন, হে আমার দেশবাসী! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। আল আরাফ-৬৫

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ؛

এবং ছামুদ জাতির প্রতি তাদের ভাই ছালেহ (আঃ)-কে পাঠিয়েছিলাম। তিনি তাঁর দেশবাসীকে ডাক দিয়ে বললেন, হে আমার কওমের লোকেরা! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।' আল আরাফ ঃ৭৩

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ

এবং মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদেরই ভাই শোয়ায়েব (আঃ)- কে পাঠিয়েছিলাম। তিনি তার কওমকে ডাক দিয়ে বললেন, হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

আল আরাফ ঃ ৮৫

শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) -এর আন্দোলনও তাকে প্রথম এভাবে মানব জাতিকে আল্লাহর দাসত্ব কবুলের আহ্বান জানাতে হয়। তাঁর জীবনের প্রথম গণভাষণের প্রধান বক্তব্য ছিলঃ

يَـاأَيُّـهَا النَّـاسُ قُـوْلُـوا لاَإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ تُـفْـلِحُـوا

হে মানব জাতি তোমরা ঘোষণা কর আল্লাহ ছাড়া সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আর কেউ নেই- তাহলে তোমরা সফল হবে। আল হাদীস

আল্লাহর দাসত্ব কবুল এবং গায়রুল্লাহর দাসত্ব বর্জনের আহ্বান জানাবার এই কাজটা আল কোরআনে বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করা হয়। কোথাও সরাসরি নির্দেশ আকারে এসেছে, যেমন সূরা নহলের শেষ দুটি আয়াতে দাওয়াতের পদ্ধতি শিখাতে গিয়ে বলা হয়েছেঃ

أُدْعُ إِلٰى سَبِيْـلِ رَبِّـكَ بِـالْـحِـكْـمَـةِ وَالْـمَـوْعِـظَـةِ الْـحَـسَـنَـةِ ۔

ডাক তোমার রবের পথের দিকে হিকমত ও উত্তম নসীহতের সাথে।

আন নাহল : ১২৫

কোথাও এসেছে রাসূলের কাজ ও পথের পরিচয় প্রদান হিসাবে। যেমন সূরায়ে ইউসুফের শেষ রুকুতে বলা হয়েছে ঃ

قُـلْ هٰـذِهٖ سَـبِـيْـلِىْٓ أَدْعُـوْٓا إِلَى اللّٰـهِ

'বলে দিন হে মুহাম্মদ (সাঃ) এটাই আমার একমাত্র পথ, যে পথে আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই।' ইউসুফ ঃ ১০৮ সূরায়ে আহযাবে ৪৫-৪৬ আয়াতে [illegible] হয়েছে

يَـٰٓأَيُّـهَا النَّبِىُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۔ وَّدَاعِـيًا إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۔

হে নবী। আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী রূপে, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শক রূপে এবং খোদার নির্দেশে তার প্রতি আহবানকারী ও উজ্জল প্রদীপরূপে।

আবার কোথাও এসেছে এ কাজের প্রশংসা বর্ণনা হিসাবে। যেমন সূরায়ে হা-মীম সিজদায়-৩৩ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَآ إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۔

আর সে ব্যক্তির কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কারও হতে পারে কি? যে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানায় এবং ঘোষণা করে যে, আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।

কোথাও এসেছে উম্মতে মুহাম্মদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে। যেমন সূরায়ে আলে ইমরানের-১০৪ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۔

তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক অবশ্যই থাকতে হবে যারা ভাল কাজের প্রতি মানুষকে আহ্বান করবে, সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দেবে।

সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াতের মূল সুর, মূল আবেদন এক ও অভিন্ন। সবার দাওয়াতের মধ্যেই আমরা কয়েকটি প্রধান দিক লক্ষ্য করতে পারি। প্রথমতঃ সবাই তৌহিদের- আল্লাহর সার্বভৌমত্বের দাওয়াত দিয়েছেন এবং গায়রুল্লাহর সার্বভৌমত্ব পরিহার করার আহ্বান রেখেছেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁরা সমাজের খুঁটিনাটি সমস্যা সমাধানের প্রসঙ্গ তুলেননি। কিন্তু আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা না থাকার ফলে যে সব বড় বড় সমস্যায় মানুষ জর্জরিত ছিল সেগুলোর কড়া সমালোচনা করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ দাওয়াত কবুল না করার পরিণাম ও পরিণতি দুনিয়া [illegible] ত কি হবে এ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে, ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। [illegible] পাশাপাশি এ দাওয়াত কবুলের প্রতিদান প্রতিফল দুনিয়া ও আখেরাতে কি হবে সে সম্পর্কেও শুভ সংবাদ শুনানো হয়েছে।

আম্বিয়ায়ে কেরামের এই দাওয়াতের মেজাজ প্রকৃতি গভীরভাবে অনুধাবনের ও অনুশীলনের চেষ্টা করলে যে কেউ বুঝতে সক্ষম হবে এই দাওয়াত ছিল যার যার সময়ের সমাজ ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তনের একটা আপোষহীন বিপ্লবী ঘোষণা। এজন্যেই প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক, ধারক, বাহক ও সুবিধাভোগীদের সাথে তাদের সংঘাত ছিল অনিবার্য।

(২) শাহাদত আলান্নাস ঃ

শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর এক পরিচয় বরং প্রধান পরিচয় যেমন দায়ী ইলাল্লাহ বা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী, তেমনি তাঁর অন্যতম প্রধান পরিচয় হল দাওয়াতের বাস্তব নমুনা হিসাবে, মূর্ত প্রতীক রূপে শাহেদ এবং শহীদ। কোরআন বলেছেঃ اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلاً . شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلاً .

আমি তোমাদের প্রতি রাসূল পাঠিয়েছি সত্যের সাক্ষীরূপে। যেমন সাক্ষী রূপে রাসুল পাঠিয়েছিলাম ফেরাউনের প্রতি। মুজাম্মিল-১৫

اِنَّآ اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا .

আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষদাতা, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে।

আল-আহযাব-৪৫

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

এভাবে আমি তোমাদের একটি উত্তম জাতি রূপে গড়ে তুলেছি- যাতে করে তোমরা গোটা মানব জাতির জন্যে সত্যের সাক্ষ্যদাতা (বাস্তব নমুনা) হতে পার এবং রাসূল (সাঃ) যেন তোমাদের জন্যে সাক্ষ্য বা নমুনা হন। আল-বাকারা ১৪৩

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْ[illegible]

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর জন্যে সত্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়াও।

আল-মায়েদা ঃ ৮

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ .

যার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সাক্ষ্য বর্তমান রয়েছে সে যদি তা গোপন করে তাহলে তার চাইতে বড় জালেম আর কে হতে পারে? আল-বাকারা ঃ ১৪০

এই শাহাদত মূলত: দাওয়াতেরই একটা বাস্তব রূপ। জীবন্ত নমুনা পেশ করার মাধ্যমেই যুগে যুগে নবী রাসূলগণ তাদের দাওয়াতকে মানুষের সামনে বোধগম্য ও অনুসরণযোগ্য বানাবার চেষ্টা করেছেন। তারা সবাই এই সাক্ষ্য দুই উপায়ে প্রদান করেছেন।

এক ঃ তারা আল্লাহর দ্বীনের পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন, এটা মৌখিক সাক্ষ্য।

দুই ঃ তারা যা বলেছেন বাস্তবে তা করে দেখিয়েছেন। মৌখিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তাদের আমল আখলাক গড়ে তুলেছেন।

শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এ ব্যাপারে উত্তম ও পরিপূর্ণ আদর্শ উপস্থাপন করেছেন। রাসূলে করীম (সাঃ) কে উত্তম আদর্শ বা উসওয়ায়ে হাসানা হিসাবে গ্রহণ করে তাঁর আদর্শের সার্থক অনুসারী ও উত্তরসূরী হিসাবে তাঁর উম্মতকেও দায়ী ইলাল্লাহ হবার সাথে সাথে শুহাদা আলান্নাসের ভূমিকা পালন করার তাগিদ স্বয়ং আল্লাহ দিয়েছেন। মক্কী জিন্দেগীর চরম প্রতিকূল পরিবেশে রাসূল (সাঃ) যে অল্প সংখ্যক সাথী পেয়েছিলেন, তাঁরা আল্লাহর নবীর দাওয়াত কবুল করে নিজেরাও দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং এ দাওয়াতের পক্ষে নিজেদেরকে বাস্তব সাক্ষী বা নমুনারূপে গড়ে তুলেন যার সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ দিয়েছেন সুরায়ে ফোরকানের শেষ রুকুতে এবং সুরায়ে মুমিনুনের প্রথম রুকুতে।

এভাবে বাস্তব সাক্ষ্যদানকারী একদল লোক তৈরী হওয়ার উপরই আল্লাহর সাহায্য এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজের সাফল্য নির্ভর করে বিধায় ইসলামী আন্দোলনে এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী।

(৩) কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ

দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা যখন প্রতিকূল পরিবেশে নানা বাধা বিপত্তি ও [illegible]তের মুকাবিলা করে সামনে এগুতে থাকে, মৌখিক দাওয়াতের পাশে তখন [illegible]র জীবনে আমূল পরিবর্তন আনার মাধ্যমে আমলি শাহাদত বাস্তব সাক্ষ্য দানে সক্ষম হয়। তাদেরকে এ দাওয়াত থেকে বিরত রাখা, তাদের আওয়াজকে স্তব্ধ করার ক্ষেত্রে জালেমের জুলুম নির্যাতন হার মানে, হার মানে লোভ প্রলোভনও। তখন সমাজের মানুষের মনের উপরে দাওয়াত প্রদানকারীদের নৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। কায়েমী স্বার্থের শ্রেণীভুক্ত লোকেরা সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে তখন তারা দায়ীদেরকে নিশ্চিহ্ন করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়।

খোদাদ্রোহী শক্তির বিরোধিতার জবাবে দায়ীদেরকে ধৈর্য্যের চরম পরাকাষ্ঠা দেখাবার নির্দেশ রয়েছে। মক্কী জীবনের শেষ দিকে তাদের জুলুম নির্যাতনের প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি সীমিতভাবে দেওয়া হয়েছে সুরায়ে নাহল এবং শুরার মাধ্যমে তাও এমন শর্ত সাপেক্ষ যে সেখানে প্রতিশোধ না নিয়ে বরং ক্ষমা করাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দায়ীগণ উল্লেখযোগ্য জনসমর্থন পাবার পর, মদিনায় একটি ইসলামী সমাজ কায়েমের পর খোদাদ্রোহী শক্তির জুলুম নির্যাতনের প্রতিশোধ নেবার অনুমতি তাদের দেওয়া হল সুরায়ে হজ্বের মাধ্যমে এবং প্রত্যক্ষ যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হলো সুরায়ে মুহাম্মদের মাধ্যমে। এইজন্যে এই সুরার আর এক নাম সুরায়ে কিতাল। ইসলামী আন্দোলনে, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজে এই সংঘাত ও সংঘর্ষ অনিবার্য। তাই তো আল কোরআনের ঘোষণা ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ.

যারা ঈমানদার তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে আর যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পথে। আন নিসা ঃ ৭৬

ইসলামী সমাজ পরিচালনার উপযোগী লোক তৈরী হলে, ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে, সেই সাথে আমলী শাহাদতের মাধ্যমে জনগণের মন জয় করে তাদের সাথে নিতে সক্ষম হলে আন্দোলন এই স্তর (সংঘর্ষের স্তর) অতিক্রম করে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। এই পর্যায়ের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে আল কোরআনের নির্দেশ ঃ

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ

ফেৎনা দুরিভূত হয়ে দ্বীন কায়েম না হওয়া পর্যন্ত লড়াই করতে থাক।

আল বাকারা ঃ ১৯৩

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ

* ফেৎনা ফাসাদ মুলোৎপাটিত হয়ে দ্বীন পরিপূর্ণ রূপে কায়েম না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে লড়াই অব্যাহত রাখ। আল আনফাল ঃ ৩৯

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَايُحَرِّمُوْنَ مَاحَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ.

যুদ্ধ কর আহলে কিতাবদের সেইসব লোকদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে না। আর আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তাকে হারাম সাব্যস্ত করে না। (তাদের সাথে লড়াই অব্যাহত রাখ) যতক্ষণ না তারা নিজেদের হাতে জিযিয়া দিতে ও ছোট হয়ে থাকতে প্রস্তুত হয়। আত তাওবা ঃ ২৯

আল কোরআনের আলোচনায় জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজকে যেমন আমরা ঈমানের অনিবার্য দাবীরূপে দেখতে পাই তেমনি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর এই অংশবিশেষ অর্থাৎ কেতাল ও ঈমানের দাবী পূরণের উপায় হিসেবে বিবৃত হয়েছে। বলা হয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ

যারা ঈমানের ঘোষণা দিয়েছে তাদের জান ও মাল আল্লাহ খরিদ করে নিয়েছেন বেহেশতের বিনিময়ে। (এখন তাদের একমাত্র কাজ হল) তারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে জান দিয়ে ও মাল দিয়ে এ লড়াইয়ে তারা জীবন দেবে এবং জীবন নেবে। আত তাওবাঃ ১১১

এই কেতালের নির্দেশ মূলত: দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে বিজয়ী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা করে এ মানুষের সমাজ থেকে অশান্তির কারণ যাবতীয় ফেতনা ফাসাদের মুলোৎপাটন করার জন্যই। এ হিসেবেই আমরা আল কুরআনে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কার্যক্রমের মধ্যে ইকামাতে দ্বীনের একটা পরিভাষাও দেখতে পাই।

(৪) ইকামাতে দ্বীন

ইকামাতে দ্বীন অর্থ দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা। আর দ্বীন কায়েম বলতে বুঝায় কোন একটা জনপদে দ্বীন ইসলাম বিজয়ী আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। দ্বীন

ইসলামের পরিপূর্ণ বিধি বিধান অনুসরণ ও বাস্তবায়নের পথে কোন প্রকারের বাধা ও অন্তরায় না থাকা। কোন দেশে যদি ইসলামী অনুশাসন বা কোরআন সুন্নাহর বিপরীত আইন চালু থাকে তাহলে জীবন যাপনের আন্তরিক নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও ঐ আইনের কারণে তা মানা সম্ভব হয় না। কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যদি ইসলামী আদর্শের বিপরীত কিছু শিখায় এবং ইসলাম না শিখায় তাহলে সেখানেও ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার মত মন মানসিকতাই তৈরী হয় না। যে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ও পরিবেশ ইসলামী আদর্শের বিপরীত সেখানেও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা সম্ভব নয়। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজ জীবনের চাবিকাঠি যাদের হাতে, ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক সর্বসাধারণ তাদের অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। সুতরাং সমাজের এই নেতৃস্থানীয় ও প্রভাবশালী জনগোষ্ঠী যারা দেশ, জাতি ও সমাজ জীবনের স্নায়ুকেন্দ্রগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে তারা যদি ইসলামী আদর্শ বিরোধী হয় তাহলেও সেই সমাজের মানুষ দ্বীন ইসলাম অনুসরণ করার সুযোগ পায় না।

ব্যক্তি জীবনে ব্যক্তিগত উদ্যোগে যতটা দ্বীন মানা হয় তা পরিপূর্ণ দ্বীনের তুলনায় কিছুই নয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে সামগ্রিক ও পরিপূর্ণ দ্বীন মানা তো দূরের কথা আনুষ্ঠানিক ইবাদতগুলোরও হক আদায় করা হয় না। ব্যক্তিগত উদ্যোগে নামায আদায় হতে পারে কিন্তু কায়েম হয় না। অথচ নামায কায়েমেরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; আদায়ের নয়। এমনিভাবে যাকাত আদায়ও সঠিক অর্থে ব্যক্তিগত উদ্যোগে হতে পারে না। রোযা তো এমন একটা পরিবেশ দাবী করে যা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সম্ভব নয়। হজ্জের ব্যাপারটা আরও জটিল। নামায, রোযা এবং যাকাত তো ব্যক্তি ইচ্ছা করলে সঠিকভাবে হোক বা ভুল হোক তবুও আদায় করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ছাড়পত্র ছাড়া হজ্জের সুযোগ বর্তমান ব্যবস্থায় না থাকায় ব্যক্তি ইচ্ছা করলেও হজ্জের ফরজ আদায় করতে পারছে না। সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ নিষেধের কোন একটিও পালন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। অর্থনৈতিক জীবনে আমরা সুদ বর্জন করতে সক্ষম হচ্ছি না। সমাজ জীবনে বেপর্দেগী ও উলঙ্গপনা- বেহায়াপনা থেকে আমরা বাঁচতে পারছি না। জেনা শরীয়তে নিষিদ্ধ হলেও রাষ্ট্রীয় আইনে এর জন্যে লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুন-খারাবী প্রভৃতি সামাজিক অপরাধ ও নৈতিকতা বিরোধী কাজের মূলোৎপাটন করে সৎকাজের প্রসার লাভ ঘটানোর সুযোগ এখানে রুদ্ধ। যেখানে দেশে দ্বীনের আনুষ্ঠানিক ও সামগ্রিক দিক ও বিভাগের অনুসরণ ও বাস্তবায়নে উল্লেখিত কোন বাধা নেই বরং দ্বীনের বিপরীত কিছুর পথে অনুরূপ

অন্তরায় আছে সেখানেই দ্বীন কায়েম আছে বলতে হবে। এভাবে দ্বীন কায়েম হবার জন্যেই আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। সব নবী রাসূলেরই দায়িত্ব ছিল এভাবে দ্বীনকে বিজয়ী করার চেষ্টা করা। আল্লাহ তায়ালা সুরায়ে শুরায় ঘোষণা করেছেন ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ.

তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের সেই নিয়ম কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছেন যার নির্দেশ তিনি নূহ (আঃ) কে দিয়েছিলেন। আর যা এখন তোমার প্রতি যে হেদায়াত ওহির মাধ্যমে প্রদান করেছি, আর সেই হেদায়াত যা আমি ইব্রাহীম (আঃ) মুসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ) এর প্রতি প্রদান করেছিলাম (সব নির্দেশের সার কথা ছিল) যে, তোমরা দ্বীন কায়েম কর এ ব্যাপারে পরস্পরে দলাদলিতে লিপ্ত হবে না। আশ শুরা ঃ ১৩

এভাবে দ্বীন কায়েমের চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালানোটাই ইসলামী আন্দোলনের জাগতিক লক্ষ্য। আর এরই মাধ্যমে অর্জিত হয় পারলৌকিক লক্ষ্য অর্থাৎ নাজাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি।

শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে এ দুনিয়ায় পাঠাবার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল কোরআনে যা বলা হয়েছে তারও সার কথা এটাই।

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজের আওতাভুক্ত অপর কাজটি আমর বিল মারুফ ও নেহী আনেল মুনকার সঠিকভাবে দ্বীন কায়েম হবার পরেই হতে পারে। আল কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ.

এরা তো ঐসব লোক যাদেরকে আমি দুনিয়ায় ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব দান করলে তারা নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজে বাধা দান করে। আল-হজ্জ ঃ ৪১

(৫) আমর বিল মারুফ ও নেহি আনেল মুনকার

সৎকাজের আদেশ প্রদান ও অসৎকাজে বাধা দানের কাজটা বিভিন্ন পর্যায়ে আঞ্জাম দেওয়া যায়ঃ

এক ঃ সাধারণভাবে গোটা উম্মতে মুহাম্মদীরই এটা দায়িত্ব। এক দিকে এ দায়িত্ব তাদের পক্ষ থেকে আঞ্জাম দেবে তাদেরই আস্থার ভিত্তিতে পরিচালিত রাষ্ট্র ও সরকার। অন্য দিকে এ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে তারা যার যার জায়গায়, এলাকায় এ কাজ আঞ্জাম দিতে বাধ্য।

দুই ঃ সরকারী প্রশাসনের মাধ্যমে এ কাজ আঞ্জাম পাওয়াটাই শরীয়তের আসল স্পিরিট। ইসলামী সরকারের গোটা প্রশাসন যন্ত্রই একাজে ব্যবহৃত হবে। আবার এর জন্যে নির্দিষ্ট কোন বিভাগও থাকতে পারে।

আমরা উপরে যে পাঁচটি বিষয়ে আলোচনা করলাম অর্থাৎ দাওয়াত ইলাল্লাহ, শাহাদাতে হক, কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ, ইকামাতে দ্বীন এবং আমর বিল মারুফ ও নেহি আনেল মুনকার এই সবটার সমষ্টির নাম ইসলামী আন্দোলন বা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী আন্দোলনের শরয়ী মর্যাদা

আল কোরআনের আলোকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর আওতাভুক্ত যে কাজগুলি আলোচনা করা হ'ল, ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এসবগুলো কাজই ফরজ। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন যে ফরজ এতে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ফরজের ক্ষেত্রে ফরজে আইন ও কেফায়ার বিতর্ক তোলারও কোন সঙ্গত কারণ নেই। ফরজে কেফায়াও ফরজই এবং যে কোন নফল ও সুন্নাত কাজের তুলনায় বহুগুণে উত্তম ও অনেক বেশী মর্যাদাসম্পন্ন কাজ। উপরন্তু ফরজে কেফায়ার প্রসঙ্গটা আসে কেবল কেতালের পর্যায়েই। কেতালের ব্যাপারে বৃদ্ধ, রুগ্ন প্রভৃতিকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, দাওয়াতের কাজ যে কোন স্থানে যে কোন অবস্থায় একজন মানুষ আঞ্জাম দিতে পারে। সত্যের সাক্ষ্য পেশের ব্যাপারটাও এই পর্যায়েরই। ইকামাতে দ্বীন তো ব্যাপক অর্থবোধক একটি পরিভাষা যার মধ্যে দাওয়াত, শাহাদাত, কেতাল এবং আমর বিল মারুফ

ও নেহী আনেল মুনকারও শামিল। সুতরাং এর বেশীরভাগ কাজগুলো যে কোন মানুষ যে কোন অবস্থায় আঞ্জাম দিতে পারে।

কোরআন এবং সুন্নাহর আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করলে আরো সুস্পষ্টভাবে যে সত্যটি আমাদের সামনে ভেসে উঠে তা হল- ইসলামী আন্দোলন বা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজ শুধু ফরজ তাই নয়, সব ফরজের বড় ফরজ। অন্যান্য ফরজ কাজ সমূহের আঞ্জাম দেওয়া সম্ভবই নয়- এই ফরজ আদায় না করে। নিম্নের ছয়টি বিষয়ের আলোকে বিচার করলে আমরা এর গুরুত্ব আরও ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারব।

১। মানুষ আল্লাহর খলিফা। খলিফা হিসাবে দুনিয়ায় তাকে যে কাজটি করতে বলা হয়েছে তা হল আল্লাহর দ্বীনের ভিত্তিতে জীবন যাপন করা। একমাত্র আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলা-জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও বিভাগে এটা করতে হলে ইসলামী আন্দোলন ছাড়া গত্যন্তর নেই।

২। আল্লাহর খলিফা হিসাবে মানুষ এই দুনিয়ায় কি দায়িত্ব পালন করবে, কি ভাবে সে দায়িত্ব আঞ্জাম দেবে তা শিখাবার জন্যেই এসেছেন যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরাম (আলায়হিমুস সালাম)। তারা সবাই আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। কোন একজন নবীর জীবনেও এর ব্যতিক্রম কিছু দেখা যায় না।

৩। শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাজ সম্পর্কে আল কোরআন যে সব ঘোষণা দিয়েছে তার মূল কথা আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার সংগ্রাম পরিচালনা এবং নেতৃত্ব দান ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি ২৩ বছরের নবুয়তী জীবনে বাস্তবে যা করেছেন তাও একটা বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা। শুধু তাই নয় কিয়ামত পর্যন্ত অনুরূপ আন্দোলন পরিচালনার ব্যবস্থাও তিনি রেখে গেছেন। যে কাজটি তিনি নিজে আঞ্জাম দিয়েছেন, সে কাজটি কিয়ামত পর্যন্ত জারি রাখবার দায়িত্ব তিনি তাঁর উম্মতের উপর অর্পণ করেছেন।

৪। সুতরাং উম্মতে মুহাম্মদী হিসাবে পরিচয় দিতে হলে এই দায়িত্ব পালন অবশ্যই করতে হবে। উম্মতে মুহাম্মদী হিসাবে এই দায়িত্ব পালনের তাগিদ প্রথমতঃ সরাসরি আল্লাহর কালাম থেকে প্রমাণিত। দ্বিতীয়তঃ সুন্নাতে রাসূলেও এর সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। তৃতীয়ত ব্যাপার সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) ইজমা রয়েছে।

৫। আল কোরআন এবং সুন্নাতে রাসূলে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজটাকে ঈমানের অনিবার্য দাবী হিসাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ.

যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। আর যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পথে- খোদাদ্রোহিতার পথে। - আন নিসা ঃ ৭৬

৬। আল কোরআনে আখেরাতের নাজাতের উপায়- একমাত্র উপায় হিসাবে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমানের সাথে সাথে আল্লাহর পথে মাল দিয়ে ও জান দিয়ে সংগ্রাম করার, জিহাদ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং ইসলামী আন্দোলন নিছক কোন রাজনৈতিক আন্দোলন নয়। এ যুগের কোন নতুন আবিষ্কারও নয়। এ আন্দোলনের মাধ্যমেই শরীয়তের প্রধানতম ফরজ কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব। সমস্ত নবী রাসূলগণের তরিকা অনুসরণ করতে হলে উম্মতে মুহাম্মদীর হক আদায় করতে হলে, ঈমানের দাবী পূরণ করতে হলে, সর্বোপরি আখেরাতে নাজাতের পথে চলতে হলে ইসলামী আন্দোলনে যোগদান ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।

ইসলামী আন্দোলনের কাজ আল্লাহর কাজ ঃ

মানুষের জীবনে ও আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজটা মূলতঃ আল্লাহরই কাজ। সৃষ্টির সর্বত্র আল্লাহর হুকুম আল্লাহ নিজেই সরাসরি কার্যকর করছেন। মানুষের সমাজেও তারই হুকুম চলুক এটাই তার ইচ্ছা। এখানে ব্যতিক্র তটুকু যে, মানুষকে সীমিত অর্থে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। সৃষ্টি জগতের থাও আর কারও কোন স্বাধীনতা নেই। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সবাই আল্লাহর হুকুম বা তাঁর দেয়া নিয়ম-নীতি মেনে চলতে বাধ্য। কিন্তু মানুষকে আল্লাহ এভাবে বাধ্য করেননি। নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে মানুষকে এইটুকু সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ আল্লাহ দিয়েছেন যে, সে আল্লাহর দেয়া নিয়ম-নীতি অনুযায়ী চলতে পারবে, আবার এটা অমান্যও করতে পারবে। কিন্তু আল্লাহ চান যে, মানুষ তার এই স্বাধীন ইচ্ছাকে আল্লাহর হুকুম মেনে চলার কাজেই প্রয়োগ করুক। সুতরাং যখন মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছাকে আল্লাহর হুকুম মানার কাজে প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। এ কারণেই দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে আনসারুল্লাহ আল্লাহর সাহায্যকারী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা আল কোরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ.

হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও। আস সাফ ঃ ১৪

অর্থাৎ মানুষের সমাজে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা হোক আল্লাহর এ ইচ্ছা বাস্তবায়নে সাহায্য কর। এভাবে আল্লাহর কাজে সাহায্য করার অনিবার্য দাবী হল আল্লাহর সাহায্য পাওয়া। আল্লাহ বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ.

তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের স্থিতি সুদৃঢ় করে দেবেন। মুহাম্মদ ঃ ৭

সুতরাং যারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেয় তারা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যায়, আর আল্লাহও তাদের সাহায্যকারী হয়ে যান। আর আল্লাহ যাদের সাহায্যকারী হয়ে যান তাদেরকে দুনিয়ার কোন শক্তিই পরাভুত করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এভাবে যারা আল্লাহর সাহায্যকারীর তালিকাভুক্ত হয়ে যায় তারাই আল্লাহর অলি হিসাবে গৃহীত হয়। যারা এই অলিদের বিরোধিতা করে, আল্লাহ নিজে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেন। হাদীসে কুদসীতে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর থেকে বর্ণনা করছেন,

আল্লাহ বলেন ঃ "مَنْ عَادٰى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهُ لِلْحَرْبِ"

যে আমার অলির সাথে শত্রুতা করে আমি তাকে যুদ্ধের আহবান জানাই।

অবশ্য আল্লাহ যারা আল্লাহর সাহায্যকারীগণ সত্যিই আল্লাহর সাহায্যকারী কিনা, সত্যি সত্যি আল্লাহকে ভালবাসে কি না এর পরীক্ষা নিরীক্ষার একটা ব্যবস্থা আল্লাহ রেখেছেন। এই পরীক্ষায় পাশ করা ছাড়া তিনি কাউকেই অলি বা বন্ধু হিসাবে কবুল করেন না। এ পরীক্ষা সব নবী রাসূল এবং তাদের সাথী সঙ্গীদের নেয়া হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে আল্লাহ বিশ্ব জোড়া মানুষের ইমামত দান করার আগে চরম পরীক্ষা নিয়েছেন। এ সব পরীক্ষায় পাশ করার পরই আল্লাহ ঘোষণা করেছেন ঃ

إِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۔

আমি তোমাকে বিশ্বের সমস্ত মানুষের ইমাম বা নেতা বানাতে চাই- আল বাকারা ঃ ১২৪

আল্লাহ তায়ালা এভাবে তার সাহায্যকারীদের পরীক্ষা নেবার কথা আল কোরআনে বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ وَنَبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ

অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করবো যাতে তোমাদের মধ্যে কারা সংগ্রামী ও ধৈর্য্যধারণকারী তা জেনে নিতে পারি এবং তোমাদের অবস্থা যাচাই করতে পারি। মুহাম্মদ ঃ ৩১

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۔

মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, আমরা ঈমান এনেছি এতটুকু বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে- তাদের পরীক্ষা নেয়া হবে না? - আল আনকাবুত ঃ২

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ

তোমরা কি ভেবে নিয়েছ যে এমনিতেই বেহেশতে পৌছে যাবে? আলে ইমরান ১

অথচ ামাদের পূর্বের লোকদের সামনে যেসব কঠিন মুহূর্তে পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় এসেছে তারতো কিছুই এখনও তোমাদের সামনে আসেনি। তাদের উপর কঠিন থেকে কঠিনতর মুহূর্ত এসেছে- বিপদ মুছিবত তাদেরকে প্রকম্পিত করে তুলেছে- এমনকি নবী রাসূলগণ ও তাদের সাথীগণ সমস্বরে বলে উঠেছে- আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? তোমরা জেনে রাখ আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।

এভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা আল্লাহ তায়ালা তার সব নেক বান্দাদেরই নিয়েছেন এবং নিয়ে থাকেন- তাই হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اَشَدُّ الْبَلَاءِ الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَالُ فَالْاَمْثَالُ

সবচেয়ে বেশী বিপদ মুছিবত তথা পরীক্ষা নিরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন আম্বিয়ায়ে কেরামগণ। এরপর তাদের অনুসরণের ক্ষেত্রে যারা যত বেশী অগ্রসর তাদেরকে ততবেশী বিপদ মুছিবত বা পরীক্ষা নিরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা কি চান তাও পরিষ্কার করে বলেছেন ঃ

اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۔ وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ۔

তোমাদের যদিও বা কিছুটা ক্ষতি, কিছুটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে তাতে কি আর আসে যায়, তোমাদের প্রতিপক্ষেরও তো অনুরূপ বিপর্যয় এসেছে। এই দিনসমূহ (সুদিন বা দুর্দিন) তো আমারই হাতে। আমি মানুষের মাঝে তা আবর্তিত করে থাকি। এভাবে আল্লাহ জেনে নিতে চান কারা সত্যিকারের ঈমানদার এবং তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। আল্লাহ জালেমদের পছন্দ করেন না। তিনি আরও চান, ঈমানদারদের মধ্যে খাঁটি অখাঁটি হিসাবে ছাঁটাই বাছাই করতে এবং কুফরী শক্তির মুলোৎপাটন করতে। আলে ইমরান ঃ ১৪০-১৪১

আল্লাহ পাকের উক্ত ঘোষণার আলোকে পরিষ্কারভাবে আমরা বুঝতে পারি, পরীক্ষার মাধ্যমে তঃ ঈমানের দাবীর সত্যতা ও অসারতা প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়তঃ কিছু আল্লাহর দরবারে শহীদ হিসাবে মকবুল হয়। তৃতীয়তঃ শহীদদের সাথী অংশ এ কাফেলা থেকে ছিটকে পড়ে। চতুর্থতঃ পরীক্ষার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে শহীদদের সাথীদের মধ্য থেকে যারা ছবর ও ইস্তেকামাতের পরাকাষ্ঠা দেখাতে সক্ষম হয়- আল্লাহ তাদের হাতে দ্বীন ইসলামের বিজয় পতাকা দান করেন এবং তাদের মাধ্যমে কুফরী শক্তির মুলোৎপাটন করে দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন।

সুতরাং ইসলামী আন্দোলনের পথে বাধা প্রতিবন্ধকতা বিপদ মুছিবত যা কিছু আসে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষার উপকরণ হিসাবেই আসে।

তাই যাদের দিলে সঠিক ঈমানের আলো আছে তারা এসব মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করে না।

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ.

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া, নির্দেশ ছাড়া তো কোন বিপদ মুছিবত আসতেই পারে না। আর যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে আল্লাহ তাদের দিলকে সঠিক হেদায়াত দান করেন। আততাগাবুন : ১১

বস্তুতঃ ইসলাম প্রতিষ্ঠার এ আন্দোলনের পথে এমন একটা মুহূর্ত তো আসতেই হবে যেখানে পৌঁছে আন্দোলনের কর্মীগণ আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আর কোন কিছুর উপরই নির্ভর করবে না, করতে পারবে না। এমনি মুহূর্তেই আল্লাহর নৈকট্য লাভের মুহূর্ত- মেরাজের মুহূর্ত। ইসলামী আন্দোলনের কাফেলার সাথী সঙ্গীগণ যখন এই পর্যায়ে উপনীত হতে সক্ষম হয়, তখনই আল্লাহ তায়ালা তাদের বিজয় দানের ফায়সালা করেন।

একাজে শরীক হবার জন্যেও আল্লাহর অনুমোদন প্রয়োজন

ইসলামী আন্দোলনের কাজটা আল্লাহর কাজ। সুতরাং এ কাজে শরীক হতে পারাটাও আল্লাহর অনুমোদন সাপেক্ষ। অবশ্য যারাই নিষ্ঠার সাথে এ পথে চলার সিদ্ধান্ত নেয়, আল্লাহ তাদের সিদ্ধান্তকে কবুল করেন।

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا.

যারাই আমার পথে সংগ্রাম সাধনায় আত্মনিয়োগ করে আমি তাদেরকে পথ দেখিয়ে থাকি। আল আনকাবুত : ৬৯

আল্লাহর রাসুল (সাঃ)-এর সাথে যারা এ কাজে অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেছেন : هُوَاجْتَبٰكُمْ

তিনি তোমাদেরকে এই কাজের জন্য বাছাই করেছেন। সুরায়ে হজ্জ।

مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ

وَيُحِبُّوْنَهٗٓ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

তোমাদের মধ্য থেকে যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে তাদের পরিবর্তে আল্লাহ অন্য কোন সম্প্রদায়কে এ কাজের দায়িত্ব দেবেন- তারা আল্লাহকে ভালবাসবে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসবেন, তারা মুমিনদের প্রতি হবে দয়ালু, আর কাফেরদের প্রতি হবে কঠোর। তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে- কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদের পরোয়া করবে না... এটাতো আল্লাহর বিশেষ মেহেরবাণী, তিনি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি এই বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ তো গভীর জ্ঞানের অধিকারী। আল মায়েদা : ৫৪

উক্ত ঘোষণায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার এ আন্দোলনের সুযোগ পাওয়াটা আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানীর উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ গভীর জ্ঞানের অধিকারী, আল্লাহ জেনে বুঝেই এ মেহেরবানী প্রদর্শন করে থাকেন। কারা আল্লাহর এই বিশেষ মেহেরবানী পাওয়ার যোগ্য তাও আল্লাহ পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন- যারা আল্লাহকে ভালবাসবে এবং আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার মত কাজ করে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হবে। যারা এ পথে প্রাণান্তকর সংগ্রাম করবে এবং এ পথে চলতে গিয়ে কোন প্রকারের বাধা, বিপত্তি, নিন্দাবাদ, জুলুম, নির্যাতন কোন কিছুর পরোয়া করবে না অর্থাৎ দুনিয়ায় সবকিছু থেকে বেপরোয়া হতে পারবে, তাদেরকেই আল্লাহ এ কাজের জন্য যথাযোগ্য পাত্র হিসাবে গণ্য করে গ্রহণ করবেন।

এ কাজের সুযোগ পাওয়া যেমন আল্লাহর মেহেরবানী তেমনি এ কাজের উপর টিকে থাকা ও আল্লাহর মেহেরবানীর উপর নির্ভরশীল। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন :

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ.

হে আমাদের রব একবার হেদায়াত দানের পর আবার আমাদের দিলকে বাঁকাপথে নিও না। তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে খাচ রহমত দান কর- তুমিই মহান দাতা। আলে ইমরান : ৮

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য একটি সতর্কবানী

যে আন্দোলনের কাজ অতীতে আঞ্জাম দিয়েছেন নবী রাসূলগণ, যে আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও নবী রাসূলদের সার্থক উত্তরসূরীগণ, আল কোরআন যাদেরকে অভিহিত করেছে সিদ্দিকীন, সালেহীন এবং শুহাদা হিসাবে, সেই আন্দোলনে শরীক হতে পারা আল্লাহর একটি বিশেষ মেহেরবানী ছাড়া আর কিছুই নয়। এ কথা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। আল্লাহর এই মেহেরবানী যারা পায়, তারা নিঃসন্দেহে বড় ভাগ্যবান। আল্লাহর এই বিশেষ মেহেরবানীর দাবী হলো আল্লাহর প্রতি আরও বেশী বেশী কৃতজ্ঞ হবার প্রয়াস চালানো। আর সেই কৃতজ্ঞতার দাবী হলো আল্লাহর এই মেহেরবানীর পূর্ণ সদব্যবহারের আপ্রাণ চেষ্টা চালানো। নিজের যোগ্যতা প্রতিভার সবটুকু এই কাজে লাগিয়ে দেয়া। এইভাবে যতক্ষণ কোন একটা দলের বা সম্প্রদায়ের লোকেরা সম্মিলিতভাবে এবং নিষ্ঠার সাথে এ দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত থাকে ততক্ষণ আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে থাকেন, তাদের জন্য পথ খুলতে থাকেন।

কিন্তু যখন ইসলামী আন্দোলনে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ সম্মিলিতভাবে আদর্শচ্যুতির শিকার হয়ে যায়, কঠিন এই দায়িত্বের অনুভূতি হারিয়ে ফেলে, আল কোরআনের ভাষায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তখন তাদেরকে চরম দুর্ভাগ্য কুড়াতে হয়। তাদেরকে আল্লাহ তার এই বিশেষ মেহেরবানী থেকে বঞ্চিত করেন। তাদের পরিবর্তে অন্য কোন দল বা সম্প্রদায়কে এ কাজের সুযোগ করে দেন। কারণ আল্লাহ তার দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজের ব্যাপারে কোন দল বা গোষ্ঠী বিশেষকে ঠিকাদারী দেননি, কোন দল বা গোষ্ঠীর কাজ করা না করার উপর তার দ্বীনের বিজয়ী হওয়া না হওয়াকে নির্ভরশীলও করেননি। আল্লাহ তো তার দ্বীনকে বিজয়ী করবেনই। সুতরাং যারা আজ এ কাজের সুযোগ পেয়েছে তারা যদি চরম উদাসীনতার পরিচয় দেয়, অযোগ্যতা ও নিষ্ক্রিয়তার পরিচয় দেয়, তাহলে দায়িত্বহীনতা ও নিষ্ক্রিয়তার কারণে আল্লাহ তার দ্বীনের বিজয়কে ঠেকিয়ে রাখবেন না, বরং তাদের পরিবর্তে অন্যদেরকে এ কাজের সুযোগ করে দেবেন যারা তাদের মত হবে না। এই মূল বিষয়টি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে গভীরভাবে ভেবে দেখার মত।

অনেকেই মনে করে থাকে আন্দোলনে অংশ নিয়ে, সময় দিয়ে, অর্থ দিয়ে তারা আন্দোনের প্রতি মেহেরবানী করছেন। তাদের বেশ অবদান আছে, আন্দোলনকে দেবার মত অনেক অনেক যোগ্যতার অধিকারী তারা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ধরনের লোকদের মনোভাব ও মানসিকতাকে সামনে রেখেই তো আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন ঃ

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا قُلْ لَاتَمُنُّوْا عَلَىَّ اِسْلَامَكُمْ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ. (الحجرات - ١٧)

তারা ইসলাম কবুল করে যেন আপনার প্রতি অনুগ্রহ করে এই মর্মে তারা খোটা দেবার প্রয়াস পায়, আপনি বলে দিন বরং ঈমানের পথ দেখিয়ে আল্লাহই তোমাদের প্রতি ইহসান করেছেন, যদি তোমরা সত্যি সত্যিই ঈমানদার হয়ে থাক। আল-হুজুরাত ঃ ১৭

আল্লাহর এই বিশেষ অনুগ্রহের অনিবার্য দাবীঃ এর সদ্ব্যবহারের প্রতিদান এবং অপব্যবহারের পরিণাম সম্পর্কে সদা জাগ্রত ও সচেতন থাকতে হবে। এ দায়িত্ব পালনে গভীর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা দেখাতে হবে। সুবিধাবাদী মনোভাব ও আচরণ থেকে ব্যক্তি ও সমষ্টিকে মুক্ত রাখার সযত্ন প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অন্যথায় এই সৌভাগ্য পরিণত হবে। দুনিয়াতেও লাঞ্ছনা পোহাতে হবে। আখেরাতেও কঠোরতম শাস্তি ভোগ করতে হবে। এই দুর্ভাগ্যজনক পরিণাম পরিণতি থেকে বাঁচতে হলে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের কাজ করার সুযোগ প্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে-ভাগ্যবান ব্যক্তিদেরকে তাদের চলার পথে আল্লাহর সতর্ক সংকেতগুলোও সব সময় সামনে রাখতে হবে। আল্লাহর এই সতর্কবাণী সুরায়ে মায়েদায় এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَهٗ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ .

হে ঈমানদার লোকেরা তোমাদের মধ্যে থেকে যারা আল্লাহর দ্বীন থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে (দ্বীন কায়েমের সংগ্রাম থেকে পিছটান দেবে তারা যেন জেনে

...য়) আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে এ কাজের সুযোগ করে দেবেন। ...দেরকে আল্লাহ ভালবাসেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালবাসবে। তারা ...নদের প্রতি হবে রহম দিল এবং কাফেরদের মুকাবিলায় হবে কঠোর। তারা ...াম করে যাবে আল্লাহর পথে। কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদের পরোয়া করবে ...। এটা তো হবে আল্লাহ তায়ালারই অনুগহ- তিনি যাকে চান এভাবে অনুগহ প্রদর্শন করে থাকেন। তিনি তো সীমাহীন জ্ঞানের অধিকারী। আল মায়েদাঃ ৫৪

সুরায়ে তাওবায় এই সতর্ক সংকেত একটু ভিন্ন সুরে ধ্বনিত হয়েছে- আল্লাহর পথে যুদ্ধে যাবার আহ্বান জানানো হয়েছে। এ আহ্বানে সাড়া দিতে যারা গড়িমসি করছে তাদের লক্ষ্য করে বলা হচ্ছেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا
مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ۔ اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ
عَذَابًا اَلِيْمًا وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا وَاللّٰهُ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۔ (سورة التوبه : ٣٨-٣٩)

হে ঈমানদারগণ তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়তে বলা হয় তখন তোমরা মাটি আঁকড়ে পড়ে থাক। তোমরা কি দুনিয়ার জিন্দেগী নিয়েই খুশী থাকতে চাও অথচ দুনিয়ার এই পার্থিব জীবনতো আখেরাতের তুলনায় কিছুই নয়। যদি তোমরা বের না হও তাহলে (এই কাজের জন্যে) তোমাদের জায়গায় আল্লাহ অন্য জাতিকে সুযোগ করে দেবেন। তোমরা তার ... ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তো সব কিছুর উপর ক্ষমতাশালী এবং কর্তৃত্বের অধিকারী। আততাওবা ঃ ৩৮-৩৯

সুরায়ে মুহাম্মদ বা সুরায়ে কেতালে এই সতর্কবাণী এসেছে দ্বিধাদ্বন্দ্বে লিপ্ত ব্যক্তিদের মন মানসিকতার সার্বিক বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপটে। কেতালের নির্দেশ বাস্তবায়নে যাদের মনে দ্বিধা সংশয় ছিল তাদের এই দ্বিধা সংশয় সম্পর্কে একদিকে সতর্ক করা হয়েছে। সেই সাথে যে কুফরী শক্তির ভীতি তাদের মনে ছিল সেই কুফরী শক্তির অসারতা, পরিণামে তাদের ব্যর্থতা অনিবার্য, এই কথা সুস্পষ্টভাবে বলার পর আল্লাহ ঘোষণা করেনঃ

فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْا اِلَى السَّلْمِ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ
يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ۔ اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا
وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْئَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ ۔ اِنْ يَّسْئَلْكُمُوْ
هَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ ۔ هٰاَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ
تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا
يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهِ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ
قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ ۔ (المحمد : ٣٥-٣٨)

অতএব তোমরা ভগ্নোৎসাহ হবে না, আপোষ করতে যাবে না, তোমরাই বিজয়ী হবে। আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। তিনি তোমাদের আমল নষ্ট বা ব্যর্থ হতে দেবেন না। এই দুনিয়ার জীবন একটা খেলতামাশা বৈ আর কিছুই না। যদি তোমরা ঈমানদার হও এবং তাকওয়ার অধিকারী হও তাহলে তিনি তোমাদের যথার্থ প্রতিদান দেবেন। তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের মাল চাইবেন না। যদি কখন তিনি মাল চেয়ে বসেন এবং সবটা চান তাহলে তোমরা কৃপণতা প্রদর্শন করবে এই ভাবে তিনি তোমাদের মনের রোগ ব্যাধি প্রকাশ করে ছাড়বেন। দেখ তোমাদেরকে আল্লাহর মাল খরচ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, এমতাবস্থায় তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বখিলি করছে। প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের সাথেই এই বখিলির আচরণ করেছে। (এর পরিণামে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে) আল্লাহ তো (অশেষ ভাণ্ডারের অধিকারী) কারো মুখাপেক্ষী নন বরং তোমরাই তাঁর ...য্যের মুখাপেক্ষী। যদি তোমরা এ কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে ...াহ তোমাদের জায়গায় অন্য কাউকে নিয়ে আসবেন। অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না। সুরা মুহাম্মদ ঃ ৩৫-৩৮

লক্ষ্যণীয়, এই সতর্ক ও সাবধান সংকেত প্রত্যক্ষভাবে তাদেরকে শুনান হয়েছে, যারা আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে সরাসরি দাওয়াত পেয়েছিল, তার পরিচালনায় চলছিল। এমনকি তাঁর পেছনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বা জামায়াত আদায় করছিল। আর আমরা তাদের তুলনায় কি? অতএব আল্লাহর এই সতর্ক সংকেতকে ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত ব্যক্তিদেরকে সব সময় ব্যক্তিগতভাবেও সামনে রাখতে হবে, সামষ্টিক ভাবেও সামনে রাখতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী আন্দোলনের সাফল্য

আল্লাহর দ্বীনের বিপরীত মতাদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত আন্দোলনের মৌলিক পার্থক্য সর্বত্রই সুস্পষ্ট। এ পার্থক্যের সূচনা হয় উভয়বিধ আন্দোলনের কর্মক বাহকদের আকিদা বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে দুটি পরীতমুখী ধারণা ও বিশ্বাস আল্লাহর পথের আন্দোলন ও তাগুত বা গায়রুল্লাহর পথের আন্দোলনকে পরিপূর্ণরূপে দুটি ভিন্ন খাতে পরিচালিত ও প্রবাহিত করে থাকে। এই পার্থক্য যেমন সূচীত হয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তেমনি পার্থক্য সূচীত হয় কর্মসূচী গ্রহণের ক্ষেত্রেও। পার্থক্য সূচীত হয় কর্মপদ্ধতি ও কর্ম কৌশলের ক্ষেত্রেও। এভাবে আন্দোলনের চূড়ান্ত ফলাফল সাফল্য ও ব্যর্থতার ক্ষেত্রেও অনৈসলামী আন্দোলন ও ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে রয়েছে আকাশ পাতালের পার্থক্য।

ইসলামী আন্দোলন যার জন্যে, যার নির্দেশে, এর সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ণয় করতে হবে তার দেয়া মানদণ্ডেই। ইসলামী আন্দোলন আল্লাহর পথের আন্দোলন, আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের আন্দোলন, আল্লাহর নির্দেশ পালনের আন্দোলন, সুতরাং এর সাফল্যের সংজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে তাঁর কাছ থেকেই। তিনি সুরায়ে ছফের মাধ্যমে আল্লাহর পথে মাল দিয়ে জান দিয়ে জিহাদের যে নির্দেশ দিয়েছেন তাতো আখেরাতে আজাবে আলীম থেকে, কষ্টদায়ক শাস্তি থেকে বাঁচার উপায় হিসাবেই দিয়েছেন। অতপর এ কাজের দুটো প্রতিদানের কথা উল্লেখ করেছেন। এক ঃ

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

আল্লাহ তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন এবং এমন জান্নাতে স্থান দেবেন যার পাদদেশে দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত হবে। সদা বসন্ত বিরাজমান জান্নাতে উত্তম ঘর তোমাদের দান করা হবে। এটাই হল সবচেয়ে বড় সাফল্য। আসসাফ ঃ১২

আল্লাহ পাকের এই ঘোষণা থেকে আমরা পরিস্কার বুঝতে পারি আখেরাতের কামিয়াবীই হল বড় কামিয়াবী। ইসলামী আন্দোলনের ব্যক্তিদের সামনে এটাই হতে হবে প্রধান মুখ্য বিষয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে জাগতিকভাবে কোন একটা স্থানে ইসলামী আন্দোলন সফল হলে বা বিজয়ী হলেও আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যদি আদালতে আখেরাতে আল্লাহর দরবারে সাফল্যের সনদ না পায় তা হলে ঐ ব্যক্তিদের আন্দোলন ব্যর্থ বলেই বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে কোথাও ইসলামী আন্দোলন জাগতিকভাবে সফলতা অর্জন করতে নাও পারে, আর আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিগণ আখেরাতের বিচারে আল্লাহর দরবারে নেককার, আবরার হিসাবে বিবেচিত হয়, আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হয়, তারা সন্তোষ লাভে সক্ষম হয়, তাহলে তাদের আন্দোলনকে কামিয়াব বলতে হবে। মনে রাখতে হবে আল্লাহর ভাষায় এটাই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কামিয়াবী। দুই ঃ

وَأُخْرٰى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

(الصف : ١٣)

আর অপর একটি প্রতিদান যা তোমরা কামনা কর, পছন্দ কর তাও তোমাদেরকে দেয়া হবে। তোমাদের সেই বাঞ্ছিত আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় সেও অতি নিকটেই হাছেল হবে। আসসাফ ঃ ১৩

সুরায়ে নূরে এই দ্বিতীয় পর্যায়ের সাফল্য বা জাগতিক সাফল্যের কথা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একটা ওয়াদা আকারে এসেছে। অবশ্য সে ওয়াদা শর্তহীন নয়। দুটো বড় রকমের শর্ত সাপেক্ষ। বলা হয়েছেঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনবে এবং আমলে ছালেহ করবে এমন লোকদের জন্য আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে সেইভাবে দুনিয়ার খেলাফত (নেতৃত্ব) দান করবেন, যেভাবে পূর্ববর্তী লোকদেরকে খেলাফত দান

করা হয়েছে। তাদের জন্যে আল্লাহ যে দ্বীনকে পছন্দ করেছেন সেই দ্বীনকে মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। তাদের বর্তমানের ভয় ও নিরাপত্তাহীন অবস্থা পরিবর্তন করে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করবেন। আন নূর : ৫৫

উল্লেখিত আয়াতের আলোকে জাগতিক সাফল্যের চূড়ান্ত রূপ হল আল্লাহর সাহায্যে খোদাদ্রোহী শক্তিকে নেতৃত্ব কর্তৃত্বের আসন থেকে অপসারিত করে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোকদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারা। সেই সাথে তাগুতি শক্তির নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা থাকা কালে মানুষের সমাজে যে অরাজকতা ও নৈরাজ্য কায়েম থাকে, মানুষের জানমাল ও ইজ্জত আবরুর নিরাপত্তা সব সময় হুমকীর সম্মুখীন থাকে, সেই অবস্থার আমুল পরিবর্তন হয়। হাদীসে রাসূলের আলোকে একজন সুন্দরী নারী অঢেল ধন-সম্পদ ও সোনা রূপার অলংকার সহ একাকিনী দূরদুরান্তে সফর করতে পারে, তার জীবন যৌবনের উপরও কোন হামলার ভয় থাকে না, তার সম্পদ লুণ্ঠণের কোন আশঙ্কা থাকে না।

যারা ইসলামী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবে তাদের সামনে উভয় প্রকারের সাফল্যই থাকতে হবে। তবে আল্লাহ যেটাকে প্রধান ও মুখ্য সাফল্য রূপে সামনে রেখেছেন সেটাকেই মুখ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে আখেরাতের সাফল্যই যাদের চরম ও পরম কাম্য হবে, তাদেরকে আল্লাহ উভয় ধরনের সাফল্য দান করবেন। কিন্তু দুনিয়ার সাফল্য যাদের মুখ্য কাম্য হবে আখেরাতের সাফল্য হবে গৌণ ও কম গুরুত্বপূর্ণ, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা উভয় জগতে ব্যর্থ করবেন। কারণ দুনিয়ার খেলাফত তো একটা কঠিন আমানত। মানুষের সমাজে সর্বত্র ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার আমানত, সর্বস্তরের জন মানুষের অধিকার সংরক্ষণের আমানত, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের আমানত, মানুষের জানমাল ইজ্জত আবরুর হেফাজতের আমানত। এ আমানত তারাই বহন করতে সক্ষম যাদের মন মগজে দুনিয়ার কোন স্বার্থ চিন্তার স্থান নেই। অবশ্য আখেরাতের এই সাফল্য পাওয়ার পথ দুনিয়ায় নিজকে এবং আল্লাহর অন্যান্য বান্দাকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে আল্লাহর গোলামী করার সুযোগ করে দেবার চূড়ান্ত প্রচেষ্টার উপরই নির্ভরশীল। সুতরাং আখেরাতের সাফল্যকে মুখ্য ধরে নিয়ে আন্দোলনের জাগতিক সাফল্য কামনা করা দোষণীয় নয়।

ইসলামী আন্দোলন মূলতঃ নবী রাসূলদের পরিচালিত আন্দোলনেরই উত্তরসুরী। সুতরাং নবী রাসূলদের আন্দোলনের ইতিহাসের আলোকে এর সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল্যায়নই যথার্থ মূল্যায়ন। নবী রাসূলগণ সব সময় অহীর

মাধ্যমে সরাসরি আল্লাহর দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। আল্লাহ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশ যাদেরকে নবুয়তের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তারা তাদের সময়ে যার যার দেশে সার্বিক বিচারে ছিলেন উত্তম মানুষ, যোগ্যতম নেতা। এর পরও আমরা দেখতে পাই সব নবীর জীবনে সমাজে নেতৃত্বের পরিবর্তন আসেনি বা দ্বীন বিজয়ী হবার সুযোগ পায়নি। যেমন হযরত নূহ (আঃ) সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শ' বছর তার কওমের কাছে দাওয়াত দিয়েছেন। ব্যক্তিগত ভাবে দাওয়াত দিয়েছেন; লোকদেরকে একত্রে সমবেত করে দাওয়াত দিয়েছেন, গোপনে দাওয়াত দিয়েছেন, প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া ঈমান আনেনি। তাই বলে হযরত নূহ (আঃ) কিন্তু ব্যর্থ হননি।

সত্যের সংগ্রামে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টিকে থাকাই তো সফলতা। সত্যের এ সংগ্রামে ব্যর্থ হয় তারা যারা জাগতিক সাফল্যের বিলম্ব দেখে এবং আদৌ কোন সম্ভাবনা নাই মনে করে রণে ভঙ্গ দেয়, মাঝ পথে ছিটকে পড়ে। আর ব্যর্থ হয় সেই জাতি বা জনগোষ্ঠী যারা সত্যকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। যেমন হযরত নূহ (আঃ) শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দ্বীনের উপর, দ্বীনের দাওয়াতের উপর অটল অবিচল থেকে তিনি কামিয়াব হয়েছেন। পরিণামে দুনিয়ায় ধ্বংসের মুখ দেখেছে, নিশ্চিহ্ন হয়েছে, আখেরাতে তাদেরকে ভোগ করতে হবে আরও কঠিন শাস্তি।

বনি ইসরাইলের ইতিহাসে দেখা যায় তারা অনেক নবী রাসূলকেই হত্যা করেছে। তাই বলে এই নিহত বা শহীদ নবী রাসূলগণ তো ব্যর্থ হননি। বরং এখানেও ব্যর্থ হয়েছে বণি ইসরাইল। দুনিয়ার অনেক বড় মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও, আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামত পাওয়া সত্ত্বেও তারা আজ অভিশপ্ত, দুনিয়ার সর্বত্র ঘৃণিত। এটাই তাদের ব্যর্থতা। তারা আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত আর মানুষের কাছে ঘৃণিত। পক্ষান্তরে ঐ সব শহীদ নবী রাসূলগণ আল্লাহর কাছে মহা মর্যাদার অধিকারী আর দুনিয়ার সর্বত্র সত্যের সংগ্রামীদের পথিকৃত। আবার অনেক নবীই তাদের জীবনেই ঐ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নমরুদী ব্যবস্থার মুলোৎপাটন করে শান্তির সমাজ গড়তে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তির নগরী চরম জাহেলী সমাজেও শান্তি নিরাপত্তার স্থান হিসাবে স্বীকৃত ছিল। হযরত ইউসুফ (আঃ) রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হয়ে মানুষের সমাজে শান্তি ও ইনসাফ কায়েম করতে সক্ষম হয়েছেন। হযরত দাউদ (আঃ) জালুতের মত জালেম বাদশাকে পরাভূত করে খেলাফতের অধিকারী হয়েছেন, ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নমুনা উপস্থাপন করেছেন। তার সন্তান হিসাবে হযরত সোলাইমান

(আঃ) সেই শান্তির সমাজকে আরও সম্প্রসারিত করেছেন। হযরত মুসা (আঃ) ফেরাউনী শক্তির পতন ঘটিয়ে বণি ইসরাঈলকে তথা ঐ সময়ের জনমানুষকে স্বৈর শাসনের কবল থেকে মুক্ত করেছেন। সর্বশেষে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ এ দুনিয়ায় আসবে, সবার জন্যে জীবন্ত নমুনা হিসাবে শেষ নবীর আন্দোলনের সর্বাঙ্গীন সাফল্যের রূপ আল্লাহ তায়ালা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এ ভাবে জাগতিক সাফল্য আসা না আসার ব্যাপারটা নিরংকুশভাবে একমাত্র আল্লাহরই হাতে। তবে আল্লাহ এ ব্যাপারে একটা নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন। আল্লাহর দেয়া সেই নিয়মের অধীনেই এ রূপ ফলাফল সংঘটিত হয়ে থাকে।

সেই নিয়মটা হল ঃ

এক ঃ আল্লাহর দ্বীনের ভিত্তিতে মানুষের সমাজ পরিচালনার উপযুক্ত একদল লোক তৈরী হতে হবে।

দুইঃ দেশের সমাজের মানুষের মধ্যে সেটা সবাই না হলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ আল্লাহর দ্বীনকে তাদের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে চাইতে হবে।

শেষ নবী মক্কার ১৩ বছরের সাধনায় লোক তৈরী করেছেন, কিন্তু মক্কার জনগণ তখনও এটা চায়নি তাই মক্কায় তখন তখনই এটা কায়েম হয়নি। মদিনার জনগণের প্রভাবশালী এবং উল্লেখযোগ্য অংশ, আল্লাহর দ্বীনকে কবুল করতে রাজী হয়েছে, আল্লাহর রাসূলকে নেতা মেনেছে তাই সেখানে দ্বীন কায়েম হয়েছে, জাগতিক সাফল্য এসেছে। আল্লাহর ঘোষণা

اِنَّ اللّٰهَ لَايُغَيِّرُمَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَابِاَنْفُسِهِمْ

আল্লাহ ততক্ষণ কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা [illegible] তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করবে। আল রাদ-১১

এভাবে একটা দেশে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি নিম্নলিখিত কয়েকটি রূপেই হতে পারে ঃ

এক ঃ দেশ, জাতি ও সমাজ পরিচালনা করার মত পর্যাপ্ত পরিমাণে যোগ্য, সৎ, খোদাভীরু লোক তৈরী হওয়ার সাথে সাথে দেশের জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য অংশের বা অধিকাংশের সমর্থন-সহযোগিতার ভিত্তিতে ইসলাম বিজয়ী হবে।

দুইঃ লোক তৈরী হবে কিন্তু জনগণের উল্লেখযোগ্য অংশের সমর্থন পাবে না। এই সমর্থন না পাওয়ার ফলে আন্দোলনকারীদের সামনে তিনটি অবস্থা আসতে পারে।

(১) তাদের সবাইকে না হলেও উল্লেখযোগ্য অংশকে শহীদ করা হবে। যেমন হযরত হোসাইন (রাঃ) ও তার সাথীদের ব্যাপারে ঘটেছে। (২) তারা দেশ থেকে বহিষ্কৃত হবে। অথবা (৩) দেশের মধ্যেই আষ্টেপিষ্ঠে বাঁধা থাকবে।

প্রথম রূপটিকে তো সবাই সাফল্য হিসাবেই বিবেচনা করবে। কিন্তু এই সাফল্য ঝুঁকি বিহীন নয়, ইসলামী খেলাফতের মর্যাদা রক্ষা করতে পারা না পারার উপরই এর চূড়ান্ত ফলাফল নির্ভর করে। দ্বিতীয় রূপটির প্রথমটি অর্থাৎ শাহাদাত বরণ আপাত: দৃষ্টিতে ব্যর্থতা মনে হলেও সবচেয়ে ঝুঁকি বিহীন সাফল্য। সত্যি সত্যি ঈমানের সাথে কেউ এ পথে শাহাদত বরণ করে থাকলে তার চেয়ে পরম সাফল্যের অধিকারী আর কেউ নেই, তার চেয়ে বড় ভাগ্যবান আর কেউ নেই। আল্লাহর রাসূলের সুস্পষ্ট ঘোষণা ঃ

مَوْتٌ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنْ حَيَاةٍ فِى مَعْصِيَةِ اللّٰهِ

আল্লাহর হুকুম পালনে মৃত্যু বরণ করা, তার নাফরমানীর মধ্যে বেঁচে থাকার চেয়ে উত্তম। আল- হাদীস

দ্বিতীয় পর্যায়ের দুই এবং তিন নম্বর রূপটিও বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। দেশ থেকে বহিষ্কৃত হবার পর, সর্বস্ব ত্যাগ করতে বাধ্য হবার পর, অথবা দেশের মাঝেই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা থাকার কারণে যদি কারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, আদর্শিক বিপর্যয় ঘটে, হতাশা নিরাশার কারণে হাত পা ছেড়ে বসে পড়ে, অথবা বাতিল শক্তির সাথে আপোষে চলে যায়, বা জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার সাথে আপোষ করে বসে, তাহলে তাকে বা তাদেরকে অবশ্যই ব্যর্থ বলতে হবে। কিন্তু এরপরও যারা ছবর ও ইস্তেকামাতের পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারে, তাদের পরাজয় নেই, ব্যর্থতা নেই, বরং তাদেরকে যারা বহিষ্কার করে, কোণঠাসা করে পরিণামে ব্যর্থ হয়, পরাজিত হয় তারাই।

জাগতিক সাফল্যের [illegible] আনিক শর্তাবলী

সুরায়ে ছফে অ[illegible]ণা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জাগতিক সাফল্যের শুভ সংবাদ দেবার পরেই ঘোষণা করেছেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ

أَنْصَارُ اللّٰهِ فَامَنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِى اِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظَاهِرِيْنَ.

তোমরা যারা ঈমান এনেছ আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও। যেমন ঈসা (আঃ) হাওয়ারীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীগণ উত্তরে বলেছিল, আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। এই মুহূর্তে বনি ইসরাইলের একটা অংশ ঈমান আনল। আর একটা অংশ কুফরী করল। অতপর আমি ঈমানদারদেরকে তাদের দুশমনদের মোকাবিলায় সাহায্য করলাম ফলে তারাই বিজয়ী হলো। আস সাফ ঃ ১৪

এই বিজয় কি ভাবে এসেছিল? একটা হাদীসে দেখা যায়, আল্লাহর রাসূল হযরত ঈসা (আঃ) এর সাথীদের ন্যায় ভূমিকা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীসের বর্ণনা নিম্নরূপ

একদা রাসূল (সঃ) সাহাবায়ে কেরামদের বলেছিলেন, এমন একটা সময় আসবে যখন আমার উম্মতের রাজনৈতিক অবস্থা বিকৃত হয়ে যাবে। এমন লোকেরা ক্ষমতায় থাকবে যদি তাদের অনুসরণ করা হয়, তাহলে গোমরাহ হবে। আর যদি তাদের বিরোধিতা করা হয় তাহলে গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে। এরপর সাহাবায়ে কেরামগণ বলে উঠলেন-

كَيْفَ نَصْنَعُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

এমন অবস্থায় আমরা কি করব হে আল্লাহর রাসূল। উত্তরে রাসূল (সঃ) বললেন ঃ

" كَمَا صَنَعَ اَصْحَبُ عِيْسٰى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ م قُتِلُوْا بِالْمِنْشَارِ نُصِبُوْا عَلَى الشُّنُقِ . مَوْتٌ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنْ حَيَاةٍ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ.

তোমরাই সেই ভূমিকা পালন করবে যে ভূমিকা হযরত ঈসা (আঃ) এর সাথীগণ পালন করেছিলেন। তাদেরকে করাত দিয়ে চিরে হত্যা করা হয়েছে। ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে, (তবুও তারা আপোষ করেনি, নতি স্বীকার

করেনি)। এভাবে আল্লাহর আনুগত্যের মাঝে মৃত্যু বরং নাফরমানীর মাঝে বেঁচে থাকার চেয়ে উত্তম।

এভাবে একদল নিবেদিতপ্রাণ মর্দে মুমিন মর্দে মুজাহিদের চূড়ান্ত ত্যাগ কোরবানীর রক্ত পিচ্ছিল পথ বেয়েই এ সাফল্য অতীতে এসেছে- এখনও আসতে পারে আগামীতেও আসবে ইনশাআল্লাহ।

সুরায়ে নূরের যে স্থানে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার খেলাফত দানের ওয়াদা করেছেন সেখানেই এ খেলাফত যারা পেতে চায় তাদেরকে কতিপয় নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে প্রণিধানযোগ্য।

يَعْبُدُوْنَنِىْ لَايُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ. وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ. لَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَمَا وٰهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ.

অতএব তারা একমাত্র আমারই ইবাদত করবে এবং আমার সাথে আর কাউকে শরীক করবে না। আর যারা এর পরেও নাশুকরী করবে তারা তো ফাসেক। নামায কায়েম কর, জাকাত আদায় কর এবং রাসূলের এতায়াত কর। আশা করা যায় তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে। যারা কুফরী করছে তাদের ব্যাপারে এমন ভুল ধারণা পোষণ করবে না যে, তারা আল্লাহকে অপারগ করে ফেলবে। তাদের শেষ ঠিকানা জাহান্নাম। আহ কতই না জঘন্য সেই বাসস্থান। আন নূর ঃ ৫৫-৫৭

এখানে একদিকে নির্ভেজাল তৌহীদের অনুসরণ সর্বপ্রকারের শেরক বর্জন, আল্লাহর প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞ[illegible] প্রকাশের; অকৃতজ্ঞতা থেকে বেঁচে থাকার এবং নামায কায়েম ও [illegible]ায়ের নির্দেশের পাশে মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতির জন্যে কুফরী শক্তির অস[illegible]র্কে সঠিক ধারণা পোষণের তাকিদ করা হয়েছে। তাদের শক্তি আপাত: দৃষ্টিতে যত বেশীই মনে হোক না কেন তবুও তারা দুর্জয় শক্তির অধিকারী নয়। এই কথাটা আল্লাহ তায়ালা অন্যত্রও ব্যক্ত করেছেন ঃ

وَمَنْ لَايُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى الْاَرْضِ.

যারা আল্লাহর পথের আহবানকারীর আহবানে সাড়া দেয় না- তারা এ দুনিয়ার কোন দুর্জয় শক্তির অধিকারী নয়। আল আহকাফ -৩২

যার সার কথা, দায়ী আন্দোলনকারী নিছক জাগতিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে লাভ ক্ষতির হিসাব কষবে না বরং আল্লাহর শক্তির উপর ভরসা করে তার ওয়াদার প্রতি একিন রেখে বিজয়ের পথে পা বাড়াবে।

সুরায়ে মুজাদালায় আল্লাহ তায়ালা হেজবুশশায়তানের ব্যর্থতার নিশ্চিত ঘোষণা ও ঈমানদারদের বিজয়ের দ্ব্যর্থহীন আশ্বাস দিয়েছেন ঃ

كَتَبَ اللّٰهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيْ إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ. لَاتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَوْ كَانُوْا اٰبَاءَهُمْ أَوْ اَبْنَاءَهُمْ أَوْ اِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيْرَتَهُمْ أُولٰئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ أُولٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

আল্লাহ লিখে দিয়েছেন যে, আমি এবং আমার রাসূলই বিজয়ী হব। বাস্তবিকই আল্লাহ তায়ালা পরম পরাক্রমশালী। তোমরা কখনই এমনটি পাবে না যে, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান এনেছে তারা এমন লোকদের সাথে মহব্বতের সম্পর্ক রাখে, যারা আল্লাহ ও রাসুলের বিরোধিতা করে। হোক না তারা তাদের বাপ, বেটা, ভাই অথবা তাদের বংশের কেউ। এরা তো এমন ভাগ্যবান লোক যাদের দিলে আল্লাহ তায়ালা সুদৃঢ় ঈমান দান করেছেন। এবং নিজের পক্ষ থেকে একটি রূহ দ্বারা তাকে শক্তি দান করেছেন- আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাতে স্থান দেবেন যার পাদদেশ দিয়ে ঝরণা ধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তোমরা ভাল করে জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সাফল্য মণ্ডিত হবে। আল মুজাদালা ঃ ২১-২২

আল্লাহ তায়ালার এই ঘোষণার মধ্যে আমরা ছয়টি জিনিস পাই, যার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দল হওয়া যায় এবং সকল বাধা প্রতিবন্ধকতা

অতিক্রম করে, সকল প্রকারের পরীক্ষা নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আন্দোলনকে বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌছান যায় আল্লাহর সাহায্যে।

এক ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই বিজয়ী হবেন, শয়তানি শক্তিকে পরিণামে পর্যুদস্ত ও বিপর্যস্ত হতেই হবে। আল্লাহর এই ওয়াদার প্রতি, আল্লাহর এই ঘোষণার প্রতি পাকাপোক্ত একিন পোষণ করতে হবে।

দুই ঃ আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের দুশমনী করে এমন লোকেরা পরম আপনজন, নিকটাত্মীয় হলেও তাদের সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা যাবে না।

তিন ঃ নিছক ঈমানের দাবী নয় এমন ঈমান যা আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বীকৃত, আল্লাহর বিশেষ তৌফিকের ফলে লব্ধ এমন ঈমানের অধিকারী হতে হবে।

চার ঃ আল্লাহ প্রদত্ত রূহানী শক্তির বলে বলিয়ান হতে হবে।

পাঁচ ঃ আল্লাহর রেজামন্দি লাভে সক্ষম হতে হবে।

ছয় ঃ আল্লাহর যাবতীয় ফায়সালা খুশি মনে ও দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করার মত মন মানসিকতার অধিকারী হতে হবে।

জাগতিক প্রস্তুতি গ্রহণ ও শক্তি অর্জনের পাশাপাশি কোরআনিক এই শর্তগুলো অবশ্যই পূরণ করতে হবে। তাহলেই ইসলামী আন্দোলনের জাগতিক সাফল্য আশা করা যেতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী সংগঠন

সংগঠনের অর্থ ও সংজ্ঞা

সংগঠন শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ organisation যার শাব্দিক অর্থ বিভিন্ন organ কে একত্রিতকরণ, গ্রন্থায়ন ও একিভূতকরণ বা আত্মিকরণ। মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেও এক একটি Organ বলা হয়। মানব দেহের এই ভিন্ন ভিন্ন Organগুলোর গ্রন্থায়ন ও একীভূতকরণের রূপটাই সংগঠন বা Organisation, এর একটা জীবন্ত রূপ। মানব দেহের প্রতিটি সেল, প্রতিটি অনু পরমাণু একটা নিয়মের অধীনে সুশৃঙ্খলভাবে যার যার কাজ সম্পাদন করে যাচ্ছে। মানুষের দৈহিক অবয়বগুলোর বিভিন্নমুখী কার্যক্রমের প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব এখানে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ আছে। আবার কাজের সুষম বন্টনের ব্যবস্থা আছে, পরস্পরের সাথে অদ্ভুত রকমের সহযোগিতা আছে। মন মগজের চিন্তা-ভাবনা কল্পনা ও সিদ্ধান্তের প্রতি দেহের বিভিন্ন Organ দ্রুত সমর্থন-সহযোগিতা প্রদর্শন করে। তেমনি দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অভাব অভিযোগ অসুবিধা ইত্যাদির ব্যাপারে দেহরূপ এই সংগঠনের কেন্দ্র অর্থাৎ মন ও মগজ দ্রুত অবহিত হয়।

মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এই একিভূত রূপের অনুকরণে কিছুসংখ্যক মানুষের নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এক দেহ এক প্রাণ রূপে কাজ করার সামষ্টিক কাঠামোকেই বলা হয় সংগঠন বা Organisation

মুসলিম জনগোষ্ঠী মূলত একটি সংগঠন, জামায়াত বা Organisation। এই জন্যই হাদীসে রাসূলে এই জনসমষ্টিকে একটি দেহের সাথে তুলনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعِيْ لَهُ سَائِرُ

الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمّٰى. (اَخْرَجَهُ الْبُخَارِىْ وَمُسْلِمْ)

হযরত নুমান বিন বশীর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন মুমিনদের পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া ও সহানুভূতি মানব দেহ সদৃশ। তার কোন অংশে রোগাক্রান্ত হলে সমগ্র দেহ নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে দুর্বল হয়ে পড়ে। (বোখারী ও মুসলিম)

এখানে মুমিনদের পরস্পরের সাথে সম্পর্ক, সংযোগ ও অনুভূতি প্রবণতার বাঞ্ছিত রূপটা কি হওয়া উচিত, এটা বোঝানোর জন্যেই মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পারস্পরিক সম্পর্কের, সংযোগের এবং সহানুভূতি ও সহযোগিতার বাস্তবরূপটি উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

এভাবে মানুষের বিভিন্ন Organকে বিচ্ছিন্ন করে রাখলে যেমন মানব দেহ বেকার ও অচল হবার সাথে সাথে ঐ সব Organগুলোও বেকার হয়ে যায়, তেমনি এটা সত্য সমাজবদ্ধ জীব মানুষের বেলায়ও। এই সমাজ একটা দেহ এবং ব্যক্তি মানুষগুলো এই সমাজ দেহের এক একটা Organ। মানব দেহের Organগুলো পরস্পর বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন হলে যেমন দেহ ও Organ সবটাই বেকার হয়ে যায়, তেমনি সমাজ দেহের Organ গুলো ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লে, ব্যক্তি মানুষগুলোও মানুষের মর্যাদায় থাকতে পারে না এবং এই ব্যক্তিদের সামষ্টিক যে রূপটা সমাজ নামে পরিচিত সেটাও মানুষের সমাজ নামে অভিহিত হবার যোগ্য থাকে না। সুতরাং সংগঠন মানুষের জন্যে মানুষের ব্যক্তি ও সামষ্টিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে একটা একান্ত স্বাভাবিক ও অনিবার্য প্রয়োজন।

মানুষের এই সংগঠনের আদর্শ রূপ হবে মানব দেহেরই অনুরূপ। অর্থাৎ দেহের যেমন একটা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ আছে যার মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নির্দেশ দেয়া হয়, সিদ্ধান্ত জানানো হয়, প্রয়োজন পূরণ করা হয়, অভাব অভিযোগ দ্রুত শোনা হয়, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো যেমন সুন্দরভাবে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্র[illegible]নে চলে আবার যার যার জায়গায় স্বাধীনও বটে, আবার বিভিন্ন অ[illegible] পরস্পরের মধ্যেও একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, সুন্দর আদান প্রদা[illegible] team spirit আছে। তেমনি মানুষের সমাজ পরিচালনার জন্যে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সংস্থা থাকতে হবে। যার কাজ হবে সমাজের, সমষ্টির ও ব্যক্তির স্বার্থ সংরক্ষণ করা। এমনভাবে যেন সমষ্টির স্বার্থ সংরক্ষণ ব্যক্তির স্বার্থ ও স্বাধীনতাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। আবার ব্যক্তির স্বার্থ ও স্বাধীনতা যেন সমষ্টির এবং অন্য ব্যক্তির স্বার্থ ও স্বাধীনতার পরিপন্থী না হয়।

এখানে সমাজ ব্যক্তিদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে। ব্যক্তিরা যুগপৎভাবে সমাজের প্রতি এবং পরস্পর একে অপরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে।

মানুষের সমাজের এই রূপটাই আদর্শ রূপ। মানবতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ এমনি একটা পরিবেশ, এমনি একটা সামাজিক কাঠামোতেই সম্ভব হতে পারে।

মানুষের এই সহজাত এবং স্বাভাবিক প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ কোন না কোন প্রক্রিয়ায় সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের প্রয়াস চালিয়ে আসছে। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক কোন না কোন একটা সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, মেনে চলারও চেষ্টা করেছে। কিন্তু মানুষের সমাজে বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন বর্ণের, গোত্রের, দেশের ও ভাষার মানুষকে এক দেহ, এক প্রাণ হিসাবে গ্রন্থায়নে, আত্মিকরণে- মানুষের মনগড়া কোন প্রচেষ্টাই আজ পর্যন্ত সফল হয়নি- হতে পারছে না। মানুষের তৈরী সমাজ কাঠামো সংগঠন, সংস্থা ভারসাম্য মূলক কোন ব্যবস্থাই মানব জাতিকে উপহার দিতে পারেনি। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। কখনও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তির স্বার্থ ও স্বাধীনতা এতটা খর্ব করেছে যে, তার প্রতিক্রিয়া, সমাজকেও প্রভাবিত করেছে, কারণ সমাজ তো ব্যক্তিরই সমষ্টি। আবার কখন অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা, সামাজিক স্বার্থ ও সমাজের ব্যক্তিদের পারস্পরিক স্বার্থ ও স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করেছে। ফলে কোথাও মনুষ্যত্ব ও মানবতার বিকাশ সাধনের সুযোগ হয়নি। বরং মানুষের সমাজে পাশবিকতা, পৈশাচিকতা ও বর্বরতাকেই লালন করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

পক্ষান্তরে মানব জাতি ইতিহাসের ফাঁকে ফাঁকে সমাজের আদর্শ রূপও দেখেছে। যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নবী রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত নীতি পদ্ধতির ভিত্তিতে। সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) প্রতিষ্ঠিত সমাজ এবং খোলাফায়ে রাশেদীন পরিচালিত সমাজই সর্বকালের সর্বযুগের জন্য আদর্শ সমাজ ও সংগঠন, যেখানে বিভিন্ন গোত্রের, বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন ভাষার মানুষকে এক দেহ এক প্রাণ রূপে গড়ে তোলা হয়েছে। ব্যক্তি স্বার্থ ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করেও সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও ইনসাফ সার্থক রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। উল্লেখিত আদর্শ সমাজ সংগঠনের আওতায় মানুষের জীবনে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নবী রাসূলগণ সবাই একই ধরনের মৌলিক নীতি ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। অবশ্য পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে কর্ম কৌশল ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। আজকের বিশ্বের মানব জাতিকে যদি আমরা এক দেহ এক প্রাণ রূপে সংগঠিত করতে চাই

তাহলে (এবং করতেই হবে) ঐ সব মৌলিক নীতি পদ্ধতি এবং শেষ নবী (সাঃ) গৃহীত কর্মকৌশল অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। শেষ নবী (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সারা বিশ্বের মানুষ আবার খেলাফত আলা মিনহাজিন্নাবুয়াতের সাক্ষাৎ পাবে এবং নবী রাসূলগণের গৃহীত সেই নিয়ম পদ্ধতির ভিত্তিতে গোটা বিশ্বের মানুষ আবার এক দেহ এক প্রাণ হবে। নিখিল বিশ্বে গোটা মানব সমাজের এই বৃহত্তর সমাজ সংগঠনই ইসলামী সংগঠনের মূল লক্ষ্য। আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন সমূহ মূলতঃ এই বৃহত্তর লক্ষ্য পানেই ধাপে ধাপে ও পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হচ্ছে।

ইসলামের সঠিক আকিদা বিশ্বাসের ভিত্তিতে দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতে মুক্তির উদ্দেশ্যে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত কিছু সংখ্যক লোকের সম্মিলিত ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার নাম ইসলামী আন্দোলন, আর এর সামষ্টিক রূপ কাঠামোর ও প্রক্রিয়ার নাম ইসলামী সংগঠন।

ইসলামের সাথে আন্দোলন যেমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, ইসলাম ও আন্দোলন যেমন সম্পূর্ণরূপে এক ও অভিন্ন, ইসলামের সাথে সংগঠনের সম্পর্কও তেমনিই। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হবার কারণে সমাজ ও সংগঠন ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। ইসলাম এই মানুষের জন্যে মানুষের সমাজের জন্যেই। সুতরাং সমাজ সংগঠন ছাড়া, জামায়াতবদ্ধ জীবন ছাড়া ইসলামের অস্তিত্ব কল্পনা করাই সম্ভব নয়। ইসলামী আদর্শের প্রথম ও প্রধান উৎস এবং আল কোরআনের শিক্ষা আলোচনা করলে কোথাও ব্যক্তিগতভাবে ইসলামী জীবন যাপনের সুযোগ দেখা যায় না। আল কোরআনের আহ্বান হয় গোটা মানব জাতির জন্য আর না হয় মানুষের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে তাদের সকলের জন্যে। কেবল মাত্র আখেরাতের জবাবদিহির ব্যাপারটা ব্যক্তিগতভাবে হবে। কিন্তু সেই জবাবদিহির মুহূর্তে সামাজিক দায়দায়িত্বের কথাও আসবে। সেই জবাবদিহিতে বাঁচতে হলেও এ দুনিয়ায় সামষ্টিকভাবে দ্বীন মেনে চলার ও দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন আছে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ خَلَقَكُمْ وَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. (البقرة- ٢١)

হে মানবজাতি! তোমাদের রবের ইবাদত কর, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তোমরা মুক্তি লাভে সক্ষম হও। আল বাকারা ঃ ২১

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

হে মানবজাতি, তোমরা ভয় কর তোমাদের সেই রবকে যিনি তোমাদেরকে একটি নফস থেকে সৃষ্টি করেছেন। অত:পর তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অত:পর তাদের দুজন হতে অসংখ্য নারী-পুরুষ ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহকে ভয় কর এবং আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারেও ভয় কর, এসব ব্যাপারে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। আল্লাহ তোমাদের উপর প্রহরীরূপে আছেন। - আন নিসা ঃ১

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

হে মানব জাতি। আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্রের ও বংশের অন্তর্ভুক্ত করেছি, যা দ্বারা তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। তোমাদের মধ্যে যারা বেশী খোদা ভীরু তারাই আল্লাহর কাছে বেশী মর্যাদাবান। অবশ্যই আল্লাহ জ্ঞানী এবং ওয়াকিবহাল। আল হুজরাত ঃ ১৩

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর, সুদ যা এখন চালু আছে বর্জন কর যদি হও সত্যিই ঈমানদার। - আল বাকারা ঃ ২৭৮

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

হে ঈমানদারগণ! সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুদ খাবে না- আল্লাহকে ভয় কর যাতে করে সাফল্য মণ্ডিত হতে পার। আলে ইমরান - ১৩০

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

হে ঈমানদারগণ লোকেরা! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের মাল ভক্ষণ করবে না- হ্যাঁ যদি পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যৌথ ব্যবসা হয়, সেটা ভিন্ন কথা। আন নিসা -২৯

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ. تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে এমন একটা ব্যবসার কথা বলব কি যা তোমাদেরকে কঠিন আযাব থেকে মুক্তি দেবে? ঈমান আন আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি। আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে। তোমরা প্রকৃত জ্ঞানী হলে বুঝবে এটাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। আস সাফ ঃ ১০-১১

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও। আস সাফ ঃ ১৪

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জু আকড়ে ধর, বিচ্ছিন্ন হবে না। আলে ইমরান ঃ ১০৩

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল অবশ্যই থাকতে হবে যারা মানব জাতিকে কল্যাণের পথে আহ্বান জানাবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে, অসৎ কাজে বাধা দেবে, তারাই সফলকাম। আলে ইমরান - ১০৪

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ أُولٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

ঈমানদার নারী পুরুষ পরস্পরের সহযোগী ও পৃষ্ঠপোষক। তাদের সম্মিলিত দায়িত্ব হল সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজে বাধা দান। তারা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে। তাদের প্রতি সত্বর আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞ। আততাওবা ঃ ৭১

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আর আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে যারা শাসন ক্ষমতার অধিকারী তাদের। আন-নিসা ৫৯

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ.

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং সৎকর্মশীল হবেন তাদের প্রতি

আল্লাহর ওয়াদা তাদেরকে দুনিয়ার খেলাফত দান করা হবে যেমন তার পূর্ববর্তীদেরকে দান করা হয়েছে। আন নূর ঃ ৫৫

ইসলামী আদর্শের দ্বিতীয় উৎস- সুন্নাতে রাসূল বা হাদীসে রাসূল সেখানেও জামায়াতী জিন্দেগীর বাইরে ইসলামের কোন ধারণা খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং এখানে তো বলা হয়েছে মাত্র দুজন কোথাও ভ্রমণ করলেও তার একজনকে আমীর করে নিয়ে জামায়াতী শৃংখলা রক্ষা করে চলবে।

আল্লাহর রাসূল জামায়াতী জিন্দেগীর ব্যাপারে আরো সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন নিম্নোক্ত হাদীসটির মাধ্যমে ঃ

عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ وَاللّٰهُ اَمَرَنِىْ بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيْ- انا امركم بخمس والله امرنى بهن.

কোন রেওয়াতে আছেঃ হযরত হারেস আল আশয়ারী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, রাসূল (সাঃ) বলেন, আমি পাঁচটি জিনিসের ব্যাপারে তোমাদেরকে আদেশ করছি (অন্য রেওয়াতে আছে আর আমার আল্লাহ আমাকে এ পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন) (১) জামায়াতবদ্ধ হবে (২) নেতার আদেশ মন দিয়ে শুনবে (৩) নেতার আদেশ মেনে চলবে (৪) আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ বর্জন করবে (৫) আর আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। আহমদ ও তিরমিজী।

উক্ত হাদীসে . .থে ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনে উপাদান, কাঠামো ও কার্যক্রমের মৌলিক কথাগুলো সংক্ষেপে অথচ সুন্দরভাবে বলা হয়েছে।

আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহ বাস্তবায়নে অন্যতম সার্থক ও সফল রূপকার হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) কোরআন ও সুন্নাহর স্পিরিট কে সামনে রেখে ইসলামের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতেও ইসলামের সংজ্ঞার পাশাপাশি

ইসলামী জামায়াত বা সংগঠনের উপাদান এবং কাঠামো এসে গেছে। তিনি বলেছেন ঃ

لاَ اِسْلاَمَ اِلاَّ بِجَمَاعَةِ وَلاَجَمَاعَةَ اِلاَّ بِاِمَارَةِ وَلاَ اِمَارَةَ اِلاَّ بِطَاعَةِ · الحديث·

জামায়াত ছাড়া ইসলামের কোন অস্তিত্ব নেই বা ধারণা নেই। আর নেতৃত্ব ছাড়া জামায়াতের কোন ধারণা করা যায় না বা অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। তেমনিভাবে নেতৃত্বও অর্থহীন আনুগত্য ছাড়া। হাদীসে রাসূলে বলা হয়েছে ঃ

يَدَ اللّٰه مَعَ الْجَمَاعَةَ وَمَنْ شَذَّ اِلَى النَّار·

জামায়াতের প্রতি আল্লাহর রহমতের হাত প্রসারিত থাকে। যে জামায়াত ছাড়া একা চলে, সে তো একাকি দোজখের পথেই ধাবিত হয়। (তিরমিজি)

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً (رَوَاه مُسْلِمٌ)

যে ব্যক্তি আনুগত্য পরিত্যাগ করে এবং জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তার মৃত্যু হবে জাহেলীয়াতের মৃত্যু। (মুসলিম)

সুতরাং আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের ইজমার ভিত্তিতে অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হয় যে, দ্বীন ইসলামে জামায়াত বিহীন জীবনের কোন ধারণা নেই। জামায়াত বিহীন মৃত্যুকে তো জাহেলীয়াতের মৃত্যু হিসাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব জামায়াত বদ্ধ হওয়া, জামায়াত বদ্ধ হয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো ফরজ। আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করে এসেছি দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করা ফরজ আর আন্দোলনের জন্য সংগঠন অপরিহার্য। কাজেই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অনিবার্য কারণেই ফরজ হতে বাধ্য।

সংগঠনের উপাদান

মানুষের সমাজে কিছু কাজ করার জন্য যে সব সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে মোটামুটি তার কিছু উপাদান থাকে। যেমন (১) আদর্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি (২) নেতৃত্ব (৩) কর্মীবাহিনী (৪) কর্মক্ষেত্র।

ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজন গড়ে ওঠা সংগঠনেও উল্লেখিত উপাদানগুলো পূর্ণাঙ্গ রূপ বিদ্যমান থাকে।

ইসলামী সংগঠন সঠিক ইসলামী আকিদা বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সংগঠন বিধায় সে একমাত্র কোরআন সুন্নাহর আদর্শকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে এবং মুমিন জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যা হওয়া উচিত তাকেই সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করে। আদর্শ যেমন কোরআন ও সুন্নাহ থেকেই নেয়, তেমনি সে আদর্শ প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী এবং কর্মপদ্ধতিও কোরআন এবং সুন্নাহ থেকেই গ্রহণ করে সংগঠনের দ্বিতীয় উপাদান নেতৃত্বের ব্যাপারে। এ সংগঠন রাসূলে খোদার অনুযায়ী নেতৃত্ব গড়ে তোলাকে অন্যতম সাংগঠনিক দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করে। এ সংগঠনের যাত্রাই শুরু হয় নেতৃত্বের মাধ্যমে। এ সংগঠনের নেতৃত্ব নায়েবে রাসূলের মর্যাদা সম্পন্ন হওয়ার কারণে এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আনুগত্য গ্রহনের প্রশ্ন একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায়। সুতরাং ইসলামী সংগঠনের উপাদান সমূহের কথা আমরা এভাবে সাজাতে পারি।

(১) কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক আদর্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কর্মসূচী এবং কর্মপদ্ধতি।

(২) কোরআন ও সুন্নাহর অনুসারী নেতৃত্ব।

(৩) কোরআন ও সুন্নাহর বাঞ্ছিত মানের আনুগত্য।

(৪) এর সাধারণ এবং বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র সমগ্র দুনিয়া, সমগ্র দুনিয়ার মানুষ। কিন্তু প্রাথমিক কর্মক্ষেত্র যারা যে দেশে জন্মেছে, যে দেশে বসবাস করছে সেই দেশ এবং সেই দেশের জনগণ।

উল্লেখিত উপাদানগুলোর সাথে আরোও দুটো উপাদান ইসলামী সংগঠনের প্রাণশক্তির ভূমিকা পালন করে আর আন্দোলনকে করে তুলে গতিশীলতার একটা হল পরামর্শের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা আর দ্বিতীয়টি হল সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনা ব্যবস্থা চালু থাকা। আমরা এ পুস্তিকার শেষাংশে নেতৃত্ব, আনুগত্য, পরামর্শ এবং সমালোচনা এই চার বিষয় পৃথক পৃথকভাবে আলোচনার চেষ্টা করব।

ইসলামী সংগঠনের প্রকৃত মডেল

শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) প্রতিষ্ঠিত ইসলামী জামায়াতই ইসলামী সংগঠনের প্রকৃত মডেল। একই ভাবে মুহাম্মদ (সাঃ) এর নেতৃত্বই ইসলামী নেতৃত্বের

একমাত্র মডেল। মুহাম্মদ (সাঃ) এর পরবর্তী মডেল হল খোলাফায়ে রাশেদীন পরিচালিত ইসলামী জামায়াত। এরপরে আর কোন মডেল নেই। আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ ঃ

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ

(الْحَدِيْثُ)

তোমাদেরকে আমার ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অবশ্য অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। রাসূল (সঃ) প্রতিষ্ঠিত এবং খোলাফায়ে রাশেদীন পরিচালিত ইসলামী জামায়াত আল জামায়াত এই মডেল অনুকরণে ও অনুসরণে- গড়ে ওঠা জামায়াতের প্রকৃতরূপ হল কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ ও ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়া। এরূপ রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমেই প্রকৃত জামায়াতী জিন্দেগীর চাহিদা পূরণ হওয়া সম্ভব। আমরা বর্তমানে এরূপ একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত আছি- অথচ হাদীসের আলোচনায় বুঝা যায় ইসলামী জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইসলামী নেতৃত্বের বয়াত গ্রহণ ছাড়া মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু। এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কি? জাহেলিয়াতের মৃত্যু থেকে বাঁচার উপায় কি?

এ অবস্থায় আমাদের বাঁচার একমাত্র উপায় হল, একমাত্র করণীয় কাজ হল আল্লাহর রাসূল ও খোলাফায়ে রাশেদীনের মডেল বা সুন্নাতকে সামনে রেখে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা খেলাফত আলা মিনহাজিন্নবুয়াত প্রতিষ্ঠার জন্যে কাজ করতে একমত এমন লোকদের সমন্বয়ে জামায়াত কায়েম করা। এই জামায়াত হবে ইসলামী রাষ্ট্রের বিকল্প। আর এই জামায়াতের নেতৃত্ব হবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের বিকল্প। এভাবে একটা অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা করে জামায়াতী জিন্দেগীর চাহিদাপূরণ করা এবং জাহেলীয়াতের মৃত্যু থেকে বাঁচা সম্ভব। কিন্তু এ জামায়াতকে প্রকৃত জামায়াত গড়ার 'means' রূপে ব্যবহার করতে হবে এটাকে 'end' ভাবা ঠিক হবে না বা 'end' ভাবলে এর মাধ্যমে যে বৃহত্তর কাজ, মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দেবার কথা তা দেয়া সম্ভব হবে না। পরিণামে এটা একটা ফেরকায় রূপ নেয়ার আশংকা থেকে যাবে।

ইসলামী সংগঠনের কার্যক্রম ও শরয়ী মর্যাদা

ইসলামী আন্দোলনের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা যে পাঁচটি পরিভাষা যেমন ঃ ১) দাওয়াত ২) শাহাদাত ৩) কেতাল ৪) ইকামাতে দ্বীন এবং ৫) আমর বিল

মারুফ ওয়া নেহী আনেল মুনকার-এর সামগ্রিক রূপটিই ইসলামী আন্দোলন বলে বুঝে থাকি। আর ইসলামী সংগঠন তো ইসলামী আন্দোলনের জন্যেই। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই ইসলামী সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত জনশক্তিকে ইসলামী সংগঠন পরিকল্পিতভাবে উল্লেখিত কার্যক্রমগুলো আঞ্জাম দেয়ার জন্যেই ব্যবহার করবে। অর্থাৎ ইসলামী সংগঠন দাওয়াত ইলাল্লাহ ও শাহাদতে হকের দায়িত্ব পালনে যথার্থ ভূমিকা পালন করবে। তার জনশক্তিকে পরিকল্পিতভাবে এর যোগ্য করে গড়ে তুলবে। বিরোধী শক্তির যথার্থ মূল্যায়ন করে তার মুকাবিলার উপায় উদ্ভাবন করে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ ভাবে দ্বীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে ধাপে ধাপে অগ্রসর হবে। বিজয়ী হলে তো গোটা জনমানুষের মধ্যে আমর বিল মারুফ ও নেহী আনেল মুনকারের দায়িত্ব আঞ্জাম দেবে। কিন্তু বিজয়ী হওয়ার আগে একদিকে সংগঠনের অভ্যন্তরে এর বাস্তবায়ন হতে হবে। সেই সাথে যেখানে যতটা সম্ভব সুযোগ সৃষ্টি করে নিয়ে এ দায়িত্ব পালনে প্রয়াস চালাতে হবে।

ইসলামী সংগঠনের নেতৃত্বের শরয়ী মর্যাদা

এরূপ সংগঠনের শরয়ী মর্যাদা প্রসঙ্গে এতটা বলা যায় যে, জাহেলিয়াতের মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্যে ও ঈমানের দাবী পূরণের জন্যে এটাই একমাত্র অবলম্বন। এটাই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিকল্প এবং রাসূল (সঃ) প্রতিষ্ঠিত ও খোলাফায়ে রাশেদা পরিচালিত জামায়াতের উত্তরসুরী হিসাবে তার প্রতিনিধিত্বের মর্যাদার অধিকারী। দ্বীনের একটা ফরজ কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্যে মসজিদ কায়েম করা হয়। সেই মসজিদকে আমরা কত বড় মর্যাদা দিয়ে থাকি আর তা আমরা দিতে বাধ্য। ইসলামী সংগঠন বা জামায়াত কায়েম হয় গোটা দ্বীন কায়েমের জন্যে যে দ্বীন কায়েম না হলে ঐ মসজিদের নামাজও সঠিক অর্থে কায়েম হতে পারে না। এই আলোকেই আমরা বুঝে নিতে পারি, ইসলামী সংগঠনের শরয়ী মর্যাদা কি?

ইসলামী সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের বিকল্প। হাদীসে রাসূলের আলোকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য রাসূলের আনুগত্যেরই শামিল। এ সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নায়েবে রাসূলের মর্যাদার অধিকারীই অধস্তন সংগঠনের নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতিনিধি হওয়ার কারণে সর্বপর্যায়ের নেতৃত্বই পরোক্ষভাবে নায়েবে রাসূলের মর্যাদা রাখে।

ইসলামী সংগঠনের সিদ্ধান্ত সমূহের শরয়ী মর্যাদা

ইসলামী সংগঠন যেহেতু কোরআন ও সুন্নাহর আদর্শকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে এবং এই আদর্শ বাস্তবায়নের জন্যেই যাবতীয় কার্যক্রম ও পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং সে সব ক্ষেত্রেই কোরআন ও সুন্নাহর নিয়ম নীতি ও spirit কে সামনে রাখার সাধ্যমত চেষ্টা করে সুতরাং কোন সিদ্ধান্ত কারও জানামতে কোরআন ও সুন্নাহর আদর্শের পরিপন্থী (বলে মনে) না হলে সেই সিদ্ধান্তকে কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশেরই মর্যাদা দিতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের মর্যাদা দিতে হবে। রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ

مَنْ اطَاعَنِى فَقَدْ اطَاعَ اللهَ وَمَنْ اطَاعَ الاَمِيرَ فَقَدْ اطَاعَنِى.
(الحَدِيثُ)

যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগর্ত্য করল। আর যে আমীরের আনুগত্য করল সে প্রকৃতপক্ষে আমারই আনুগত্য করল। আল হাদীস

সুতরাং সংগঠনের কোন সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগতভাবে কারও কাছে পছন্দ না হলে বা কারও মন মত না হলেও সে সিদ্ধান্ত দ্বিধাহীনচিত্তে মেনে নিতে হবে। এ সম্পর্কে কোন বিরূপ মন্তব্য করা বা অসন্তোষ প্রকাশ করার কোন সুযোগ নেই। এরূপ করাটা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ অমান্যের শামিল হবে।

আদর্শ ভিত্তিক ও গণমুখী নেতৃত্বের গুরুত্ব

ইসলামী আন্দোলন সঠিক অর্থে আদর্শভিত্তিক আন্দোলন, কারণ এখানে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য একটাই- আদর্শের বিজয়, দ্বীন ইসলামের বিজয়। সেই সাথে এ আন্দোলন গণমুখীও। কারণ এর জাগতিক লক্ষ্য তো দুনিয়ার সর্বস্তরের জন মানুষের কল্যাণ প্রতিষ্ঠা। সর্বস্তরের জন মানুষকে মানুষের প্রভুত্বের যাঁতাকল থেকে মুক্ত করে আল্লাহর প্রভুত্বের বিশাল ছায়াতলে আশ্রয় দেয়া। কাজেই মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী ব্যক্তি ছাড়া সবার আকর্ষণ থাকবে- আপনত্বের অনুভূতি থাকবে এ আন্দোলনের প্রতি, এটাই স্বাভাবিক। আপাতত এটা প্রকাশ পায় না সুবিধাভোগী খোদাদ্রোহী শ্রেণীর প্রভাব প্রতিপত্তি ও দাপটের কারণে। কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে এ দাপটের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। আল্লাহর সাহায্যে যখন বিজয়ের মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে তখন বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মত মানুষ সমর্থন দিতে থাকে এ আন্দোলনকে।

এই আন্দোলনের মাধ্যম যে সংগঠন তা হবে প্রধানত: আদর্শ ভিত্তিক। নেতৃত্ব সৃষ্টি, কর্মী সংগ্রহ ও গঠন, সংগঠনের বিস্তৃতি ও দৃঢ় করণ, গণসংযোগ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নীতি নির্ধারণ যাবতীয় ক্ষেত্রে আদর্শই হবে এর Guiding force। এ ব্যাপারে সামান্যতম আপোষের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু এভাবে আদর্শের প্রাধান্যের কারণে আন্দোলন ও সংগঠন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। এবং গণমুখী চরিত্র হারাবে না। কারণ ইসলামী আদর্শ স্বয়ং একটি গণমুখী আদর্শ। ইসলামী আন্দোলনের বক্তব্য মজলুম ও ভুক্তভোগী জনমানুষের সুপ্ত ও অব্যক্ত ব্যথা বেদনারই অভিব্যক্তি। দায়ী (আহবানকারী) তার বক্তব্য সার্থকভাবে আপোষহীনভাবে উপস্থাপন করতে পারলে, শাহাদতে হকের বাস্তব নমুনা তুলে ধরতে সক্ষম হলে, জনমানুষের মনের সুপ্ত ও অব্যক্ত কামনা-বাসনা, ব্যথা-বেদনা একদিন প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের রূপ নিয়ে দায়ীর পাশে দাঁড়াবে।

এভাবে ইসলামী আন্দোলনের সর্বস্তরের কর্মীবাহিনী তাদের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও আদর্শের দাবী অনুযায়ী জনমানুষের প্রতি দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে কমসংখ্যক লোক নিয়েও আন্দোলনে গণমুখী ধারা সৃষ্টি করতে পারে। একটা সংগঠনের গণমুখী হবার জন্যে পাইকারী ভাবে সর্বস্তরের মানুষের সংগঠনভুক্ত হওয়া জরুরী নয়। বরং জরুরী হল সর্বস্তরের মানুষকে সাথে নিয়ে চলতে পারে, সর্বস্তরের মানুষের কাছে আন্দোলন ও সংগঠনের বক্তব্য নিয়ে যেতে পারে, সার্থক প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, প্রতিনিধিত্ব করতে পারে কথা ও কাজের মাধ্যমে, এমন মুষ্টিমেয় লোক। কোরআন বলে

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِاِذْنِ اللهِ

কত ছোট ছোট দল বিরাট বিরাট দলকে আল্লাহর সাহায্যে পরাভূত করেছে। আল বাকারা ঃ ২৪৯

এই ছোট ছোট দল আকারে, সংখ্যা-শক্তির বিচারে ক্ষুদ্র হলেও সমাজের সজাগ সক্রীয় জনশক্তি হবার কারণে, সেই সাথে জনমানুষের উপর নৈতিক ও আদর্শিক প্রভাব প্রতিষ্ঠা হবার কারণে সর্বস্তরের জনমানুষকে সাথে নিয়ে চলা বা সংখ্যা গরিষ্ঠ শক্তি [illegible] বিজয় লাভ করা সম্ভব হয়েছে। রাসূল (সাঃ) এর সংগঠনের সূচনা লগ্নে মাত্র চারজন সাথী নিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন, সংখ্যার বিচারে এরা মাত্র চারজন। কিন্তু গুণগত বিচারে সেই সময়ের মক্কার জনজীবনের সাথে এদের ছিল নাড়ির সম্পর্ক। চারজনই গোটা জনপদের সর্বশ্রেণীর জনমানুষের প্রতিনিধিস্থানীয়। হযরত আবুবকর (রাঃ) সার্বিক বিচারে

সেই সমাজের বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীল তথা সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। হযরত খাদীজা (রাঃ) সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীসমাজের সবার প্রতিনিধিত্ব করার মত যোগ্যতা রাখতেন। বরং তার সুনাম-সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই ছিল উল্লেখযোগ্য। হযরত আলী (রাঃ) একজন কিশোর শুধু ব্যক্তি মাত্র নয়। সমাজের যুবক ও কিশোরদের প্রতিনিধিত্ব করার ও তাদেরকে সাথে নিয়ে চলবার সার্বিক যোগ্যতা তার ছিল। এভাবে হযরত জায়েদ নিছক একজন ব্যক্তি নন। একজন ক্রীতদাস মানে সেই সময়ের মজলুম ও মেহনতী মানুষের প্রতিনিধিস্থানীয়। মাত্র এই পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট কাফেলাটিকেও [যার নেতৃত্বে রাসূলে পাক (সাঃ)] আমরা সার্বিক বিচারে আদর্শের প্রশ্নে আপোষহীন একটি গণমুখী সংগঠন বলতে পারি। রাসূলে পাক (সাঃ) এর আন্দোলনের প্রাথমিক স্তরের এই সাংগঠনিক রূপটাই ইসলামী সংগঠনের মডেল এ ভাবেই একটা আন্দোলন পরিপূর্ণ আদর্শবাদী চরিত্র নিয়ে চলার সাথে সাথে গণমুখী ভূমিকাও পালন করতে পারে।

নেতৃত্বের গুরুত্ব

যে কোন আন্দোলন ও সংগঠনের নেতৃত্ব প্রধান Factor হিসাবে ভূমিকা পালন করে থাকে। ইসলামী আন্দোলন এবং সংগঠনেরও নেতৃত্বের ভূমিকা এ পর্যায়েরই। বরং আরও অনেক বেশী গুরুত্বের দাবীদার। কারণ ইসলামী আদর্শ বা জীবন ব্যবস্থাটা মূলত: নেতা কেন্দ্রিক। এর যাবতীয় কার্যক্রমে নেতৃত্বের ভূমিকা প্রধান। আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের যে কাঠামো আল কোরআন ঘোষণা করেছে তাতেও নেতৃত্বকে প্রধান ভূমিকায় রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ.

আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং সেই সব লোকেরও যারা তোমাদের মধ্যে শাসনের দায়িত্ব সম্পন্ন। আন নিসা ঃ ৫৯

লক্ষণীয় আল্লাহর এতায়াত ও রাসূলের এতায়াত আমরা কি সরাসরি সব ক্ষেত্রে করতে পারি? আমাদের ব্যবহারিক জীবনের সর্বত্রই আল্লাহ ও রাসূলের এতায়াত উলিল আমরের এতায়াতের মাধ্যমেই করা সম্ভব। এ জন্যেই রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যারা আমার আনুগত্য করে তারা আল্লাহর আনুগত্য করে।

আর যারা আমীরের আনুগত্য করে তারা আমার আনুগত্য করে। আনুগত্যের অধ্যায়ে বিষয়টি আরও বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাল্লা। নেতৃত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ.

ইমাম বা নেতা ঢাল স্বরূপ যাকে সামনে রেখে লড়াই করা যায় এবং আত্মরক্ষা করা যায়। আল হাদীস।

মাত্র দুজন কোথাও ভ্রমণে বের হলেও একজনকে নেতা মানার নির্দেশ থেকেই আমরা বুঝতে পারি মুসলমান নেতা বিহীন জীবন যাপন করতেই পারে না। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকায়েদের কিতাব সমূহে নেতৃত্ব বা ইমামতকে ইসলামের মৌলিক বিষয় হিসাবেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ঐ সব কিতাবে ইমাম নিয়োগ نصب الامام ও ইমামের মর্যাদা বিষয়ে একটা স্বতন্ত্র অধ্যায় স্থান পেয়েছে। এখানে দলিলের ভিত্তিতে ইমাম নিয়োগকে উম্মতের জন্যে ওয়াজেব বলা হয়েছে- অবশ্য এই ওয়াজেব ও ফরজের মধ্যে মানগত ও গুণগত কোন পার্থক্য নেই। প্রথম দলিল হাদিসে রাসুল থেকে বলা হয়েছেঃ

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً -مسلم.

যে ব্যক্তি ইমামের বায়াত গ্রহণ ব্যতীত মারা যায় তার মৃত্যু হবে জাহেলীয়াতের মৃত্যু। মুসলিম।

দ্বিতীয় দলিল হিসাবে পেশ করা হয় সাহাবায়ে কেরামগণের (রাঃ) ইজমা। রাসূল পাক (সাঃ) ইন্তেকালের পর তাঁর কাফন, জানাযা ও দাফনের কাজ সমাধা করার আগেই উম্মতে মুসলেমার জন্যে ইমাম নিযুক্ত করাকে তারা সর্বসম্মত ভাবে জরুরী মনে করেছেন।

মানব প্রকৃতির এটা একটা স্বাভাবিক প্রবণতা যে, সে তার চেয়ে বড়, উন্নত বা উত্তম কারও অনুসরণ করতে চায়। ইসল্যাম মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা আদর্শ, তাই-মানব জাতিকে ইসলামের পথে চলার জন্যে অনুসরণ ও অনুকরণ যোগ্য কিছু ব্যক্তি সৃষ্টিকেই ইসলাম প্রাধান্য দিয়েছে ঃ

لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.

যেন রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয়, আর তোমরা সাক্ষী হও সব লোকের জন্য। (আল হাজ্জ ঃ ৭৮) এই বক্তব্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও এটাই।

ইসলামী নেতৃত্বের সংজ্ঞা

ইসলামী নেতৃত্ব তিনটি শব্দের মর্মার্থের ধারক বাহক। (১) খলীফা (২) ইমাম (৩) আমীর

এক ঃ খলিফা অর্থ প্রতিনিধি। মানুষ মাত্রই আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলিফা। এরপরও নেতাকে খলিফা বলা হয় কেন? অন্য কথায় খোলাফায়ে রাশেদীন কোন অর্থে খলিফা ছিলেন। একটু চিন্তা করলে এবং তাদের বাস্তব কাজের সাথে মিলিয়ে একে বিচার করলে দেখা যায় তারা তিন অর্থে খলিফা ছিলেন।(১) খলিফাতুল্লাহ বা আল্লাহর খলিফা হিসাবেই আল্লাহর দ্বীন জারী করা ও আল্লাহর হুকুম আহকাম জারী করার দায়িত্ব পালন করেছেন। (২) খলিফাতুর রাসূল, রাসূল (সাঃ) এর অবর্তমানে তাঁরই কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। মুসলমানদের মূল নেতা রাসূল (সাঃ); তারা মুসলমানদের পরিচালনা করেছেন কেবল মাত্র তারই প্রতিনিধি হিসাবে। (৩) খলিফাতুল মুসলেমীন বা মুসলমানদের প্রতিনিধি। আমরা একটু আগেই উল্লেখ করেছি মানুষ মাত্রই আল্লাহর খলিফা। কিন্তু মানুষের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনে ইসলাম কবুল করে তারাই এই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করে। মুসলমানদের খলিফা বা প্রতিনিধিত্বের কাজ এ ক্ষেত্রে ইজতেমায়ীভাবে খেলাফতের দায়িত্ব পালনের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা, তদারক করা ও নিয়ন্ত্রণ করা। খোলাফায়ে রাশেদীন এই তিন অর্থেই খলিফা ছিলেন। আজকেও ইসলামী নেতৃত্বকে উল্লেখিত তিন অর্থেই খলিফার ভূমিকা পালন করতে হবে।

দুই ঃ যে সামনে চলে তাকেই ইমাম বলা হয়। নামাজের ইমামতি যিনি করেন তিনি সামনে থাকেন। শুধু সামনে থাকেন তাই নয়, তিনি তার পেছনের লোকদের যে নির্দেশ দেন সে নির্দেশ তিনি নিজে সবার আগে পালন করেন। রুকুর নির্দেশ দিয়ে তিনি বসে থাকেন বা দাঁড়িয়ে থাকেন অন্যরা রুকু করে বা তিনি সেজদার নির্দেশ দিয়ে নিজে তামাশা দেখেন, অন্যরা নির্দেশ পালন করেন এমনটি কখনো হয়না। বরং ঐসব নির্দেশের উপর তিনি আগে আমল করেন। তিনি রুকুতে যান অন্যরা তাকে অনুসরণ করেন। তিনি সেজদায় যান, তাকে দেখে অন্যরা সেজদা করেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ত্যাগ ও কোরবানীর

নজীরবিহীন উদাহরণ স্থাপনে সক্ষম হবার পর তাকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন, اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا

আমি তোমাকে মানব জাতির জন্যে ইমাম বানাতে চাই। এখানে ইমাম অর্থ যেমন নেতা তেমনি অনুসরণ ও অনুকরণ যোগ্য ব্যক্তিত্বও। ত্যাগ, কোরবানীর ক্ষেত্রে, ঈমানের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার ক্ষেত্রে এবং আল্লাহর নির্দেশ মাথা পেতে নেবার ক্ষেত্রে তিনি সারা দুনিয়ার মানুষের ইমাম বা অনুসরণীয়।

হাদীসে রাসূলের শিক্ষা অনুযায়ী নেতৃত্ব কামনা করা বা চাওয়ার এবং এ জন্যে চেষ্টা করার কোন সুযোগ নেই। সুতরাং ইমাম অর্থ যদি শুধু নেতা নেয়া হয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালার শিখানো দোয়া وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

আমাদেরকে (আমার পরিবারকে) মুত্তাকীদের ইমাম বানাও এর সাথে হাদীসে রাসূলের ঐ কথার contradiction হয়। কিন্তু যদি এখানে ইমাম অর্থ আদর্শ বা অনুসরণ যোগ্য বা অগ্রণী, অগ্রগামী অর্থ নেয়া হয় তাহলে আর কোন অসুবিধা থাকে না। প্রত্যেক মুসলমান এ কামনা করতে পারে, চেষ্টা সাধনাও করতে পারে যে তাকে অন্যান্যদের জন্যে অনুসরণ ও অনুকরণ যোগ্য আদর্শস্থানীয় হতে হবে এবং নমুনা পেশ করতে হবে। ইসলামী নেতৃত্বের মধ্যে ইমামতের এই মর্ম ও তাৎপর্যের বাস্তব প্রতিফলন থাকতে হবে।

তিন ঃ আমীর আদেশ দাতাকে বলা হয়। আমর যার পক্ষ থেকে আসে সে-ই আমীর বা উলিল আমর। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে আসল আদেশ দাতা, হুকুম কর্তা একমাত্র আল্লাহ।

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ হুকুম দেবার অধিকার তো একমাত্র আল্লাহর

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْ

তোমরা ভাল করে জেনে নাও গোটা সৃষ্টিও আল্লাহর এবং সৃষ্টির সর্বত্র হুকুমও চলবে একমাত্র তাঁরই। তাহলে আমীরের কাজটা এখানে কি? আমীরের কাজ হবে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন। আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ নিষেধের ভিত্তিতে মুসলিম উম্মতকে পরিচালনা করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ইসলামী নেতৃত্ব রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যে চারটি কাজ করবে যেমন (১) নামাজ

কায়েম করবে (২) জাকাত আদায় করবে (৩) সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং (৪) অসৎ কাজে বাধা দেবে। এ চারটি কাজের সবটাই আল্লাহর আদেশ। এখানে আমীরের দায়িত্ব শুধু আল্লাহর এই আদেশ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ইসলামী রাষ্ট্র প্রধান রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্যে নামাজ বাধ্যতামূলক করবে। বাধ্যতামূলকভাবে জাকাত আদায় করবে। কিন্তু এটা তার নিজের নির্দেশ নয়, আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ মাত্র। যেখানে কোরআন ও সুন্নাহের সুস্পষ্ট আদেশ বা নিষেধ পাওয়া যায় না, এমন ক্ষেত্রে নির্দেশ দেবার ব্যাপারে তাকে নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করতে হবে। কুরআন সুন্নাহর মূলনীতি ও Spirit এর সাথে পরিপূর্ণ সঙ্গতি রেখেই যেন নির্দেশ দিতে পারেন। ব্যক্তিগত খাহেশ প্রসূত ইজতেহাদের ভিত্তিতে কোন আদেশ নিষেধ জারী করার অধিকার ও এখতিয়ার তার নেই।

ইসলামী নেতৃত্বের প্রক্রিয়া

খোলাফায়ে রাশেদীনের নেতৃত্ব লাভের ব্যাপারটা গভীরভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করলে দেখা যাবে রাসূল (সাঃ)-এর সাথীদের মধ্যে যারা তার অনুসরণে সবচেয়ে অগ্রণী ছিলেন ঈমানের দৃষ্টিতে, তাকওয়ার দৃষ্টিতে ত্যাগ কোরবানীর দৃষ্টিতে, মাঠে ময়দানে সামগ্রিক কার্যক্রমের দৃষ্টিতে পর্যায়ক্রমে তাদের হাতেই মুসলিম জাহানের নেতৃত্ব এসেছে। আর নেতৃত্ব এসেছে মুসলিম উম্মাহর স্বতস্ফূর্ত সমর্থনের ভিত্তিতে। কারও পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্যে কোন অভিযান চালাতে হয়নি। কাজেই আমরা এখানে নেতৃত্ব নির্বাচনের দুটো মানদণ্ড পাচ্ছি। একটা আদর্শের মানে বেশী অগ্রসর। দ্বিতীয়ত: এই অগ্রণী ভূমিকার স্বাভাবিক এবং স্বতস্ফূর্ত স্বীকৃতি; এই প্রক্রিয়াই ইসলামী সংগঠনে অনুসরণীয়। এখানে স্বতস্ফূর্ত সমর্থন সংগঠনের জনশক্তির সেই অংশের প্রতি যারা নিজেদেরকে সংগঠনের কাছে পরিপূর্ণরূপে সঁপে দিয়েছে এবং সংগঠনও যাদের প্রতি পূর্ণ আস্থা পোষণ করেছে।

খেলাফত, ইমামত ও ইমারতের অর্থ ও তাৎপর্য বহনকারী নেতৃত্বই যেহেতু ইসলামী সংগঠনের কাম্য, সুতরাং সংগঠনের নেতৃত্ব হবে আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। তাকে সংগঠনের স্বীকৃতি ক্যাডারের আস্থাভাজন হতে হবে এবং ক্যাডারদের স্বত:স্ফূর্ত পছন্দের ভিত্তিতে নির্বাচিত হতে হবে। ইসলামী সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই যেহেতু আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তিত্ব, এ কারণে

অধ:স্তন সংগঠনের নেতৃত্ব হবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতিনিধি। ইসলামে পরামর্শভিত্তিক কাজের গুরুত্ব আছে বিধায় অধস্তন সংগঠন ক্যাডারভুক্ত লোকদের আস্থা যাচাইয়ের জন্য তাদের পরামর্শ অবশ্য অবশ্যই নিতে হয়। কিন্তু মূলত: এসব নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতিনিধি হিসাবেই দায়িত্ব পালন করবে এটাই রাসূলে করীম (সঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যামানার ঐতিহ্য।

ক্যাডারদের প্রতিনিধি স্থানীয় এবং আহলে রায় লোকদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা পরামর্শ সভা বা মজলিসে শুরা নেতৃত্বকে সংগঠন পরিচালনায়, নীতি নির্ধারণে, কোরআন সুন্নাহর Spirit অনুসরণে সহযোগিতা দান করবে।

নীতিগতভাবে ইসলামের যৌথ নেতৃত্বের কোন ধারণা নেই। কিন্তু ইসলামের শুরায়ী নেজাম অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হবার কারণে-অনৈসলামিক পরিবেশে একক নেতৃত্বের যেসব খারাপ দিক যথা স্বেচ্ছাচারিতা, এক নায়কত্বের প্রবণতা ইত্যাদির প্রকাশ ঘটে থাকে, এখানে সেগুলোর কোন অবকাশ থাকে না। ইসলামী নেতৃত্বের পাশে শুরায়ী নেজাম থাকার ফলে নেতৃত্বের এই System আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞানুযায়ী প্রেসিডেন্টসিয়াল ও পার্লামেন্টারী System এর খারাপ দিকগুলো থেকে মুক্ত। অথচ উভয় System এর সব ভাল দিকগুলো ধারণ করে।

আমাদের মূল নেতা মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর অবর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্বই হোক আর ইসলামী সংগঠনের নেতৃত্বই হোক তাকে রাসূলের প্রতিনিধিস্থানীয় হতে হবে। শেষ নবীর পর তাঁর উম্মতের নেতৃত্বের জন্যে কোন বিশেষ বংশের, গোত্রের বা শ্রেণীর জন্যে কোন স্থান নির্ধারিত নেই। সুতরাং উম্মতের নেতৃত্ব উম্মতের মধ্য থেকেই আসতে হবে এবং সেটা আসবে নবীর উসওয়ায়ে হাসানার অনুসরণের মানদণ্ডেই। নবী (সঃ) এর উসওয়ায়ে হাসানা নেতা কর্মী সবার জন্যেই। সুতরাং সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে এই উসওয়ায়ে হাসানা অনুসরণে যত অগ্রসর হবে, যত বেশী তৎপর হবে, নেতৃত্বের মান ততই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কারণ এ নেতৃত্ব আসবে কর্মীদের মধ্য থেকে।

আমরা ইসলামী নেতৃত্বের বৈশিষ্টময় গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল কোরআন হযরত ইব্রাহীম (আঃ), মুসা (আঃ) ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রসঙ্গে যেসব কথা উল্লেখ করেছেন তার সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়াস পাব।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা অনেক অনেক কথাই উল্লেখ করেছেন, যার সারমর্ম দাঁড়ায়, তিনি ছিলেন ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক, আল্লাহর প্রতি নিবেদিত প্রাণ ঈমানের প্রতিটি পরীক্ষায় অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি। এর পরেই আল্লাহর ঘোষণা এসেছে-

اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا

হে ইব্রাহীম (আঃ) আমি তোমাকে বিশ্বের সমস্ত মানুষের নেতা বানাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আল্লাহ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সংগ্রামী জীবন থেকে আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণের তাকিদ দিয়েছেন। তার জীবন থেকে আমরা নিম্নলিখিত শিক্ষাগুলো পেয়ে থাকি।

(১) তৌহীদের প্রশ্নে আপোষহীন, প্রয়োজনে সর্বস্ব ত্যাগে প্রস্তুত। মা, বাপ, আত্মীয় স্বজন ছাড়তে প্রস্তুত। তাঁর ঘোষণা হে আমার কওম তোমরা যেসব শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত আমি তা থেকে নিজেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করছি। আমি তো সব কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে ধাবিত হচ্ছি সেই মহান সত্তার প্রতি যিনি আসমান ও যমিনের স্রষ্টা। আর আমি মুশরীকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

(২) আল্লাহর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ, আল্লাহর যে কোন হুকুমের কাছে বিনা দ্বিধায় আত্মসমর্পণকারী। তখন তাকে বলা হয় اسلم আত্মসমর্পণ কর। তিনি বললেন

اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ আমি রাব্বুল আলামীনের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।

(৩) ঈমানের প্রতিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। আল্লাহ তাকে মানুষের নেতা হিসাবে ঘোষণা দেবার আগে তাকে সনদ দিলেন এ ভাষায়।

وَاِذِابْتَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ আল বাকারা ঃ ১২৪

আর ইব্রাহীম (আঃ) কে অনেকগুলো ব্যাপারে পরীক্ষা নেয়া হল। তিনি সে সবগুলো পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হলেন। নমরুদের অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়া তিনি পছন্দ করলেন। কিন্তু নমরুদের কাছে মাথা নত করলেন না, তৌহীদের আদর্শ থেকে বিন্দু বিসর্গ এদিক ওদিক হোলেন না, বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রী ও কোলের শিশু

সন্তানকে জন প্রাণীহীন একস্থানে নির্বাসন দেবার নির্দেশ অবলীলাক্রমে পালন করলেন। অবশেষে ঐ পুত্র সন্তান একটু বড় হবার পর, তাঁর বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করতে পারে, এমন পর্যায়ে আসার পর তাকে নিজ হাতে কোরবানী করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাঁর পরিবার থেকেই একটা মহা পরীক্ষায় ফেললেন। তাঁরা সবাই মিলে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

আল্লাহর কাছে মকবুল হবার জন্যে ইসলামী নেতৃত্বকে উল্লেখিত তিনটি গুণের অধিকারী অবশ্যই হতে হবে। মনে রাখতে হবে ঈমানের অগ্নি পরীক্ষায় ব্যর্থ ব্যক্তিদের কখনই এতবড় কাজের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হতে পারে না।

হযরত মূসা (আঃ) এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দুটো বিশেষ গুণের উল্লেখ হয়েছে, একটা امين অর্থাৎ শক্তিশালী, অপরটি قوى অর্থাৎ বিশ্বস্ত এবং আমানতদার। আর এই শক্তিশালী ও আমানতদার ব্যক্তিটি নবুয়তের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ পেয়ে ফেরাউনের দরবারে দাওয়াত নিয়ে যাবার নির্দেশ পেয়েই আল্লাহর কাছে বিশেষ কয়টি বিষয়ের জন্যে দোয়া করলেন, তৌফিক চাইলেন, সেই বিষয়গুলো সর্বকালের সর্বযুগের ইসলামী নেতৃত্বের জন্যেই পথ-পাথেয়।

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْٓ اَمْرِىْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ وَاجْعَلْ لِّىْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِىْ هٰرُوْنَ اَخِى اشْدُدْبِهٖٓ اَزْرِىْ وَاَشْرِكْهُ فِىْٓ اَمْرِىْ كَىْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا .

মূসা নিবেদন করল ঃ হে খোদা! আমার বুক খুলে দাও আমার কাজকে আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার মুখের গিরা ঢিলা করে দাও, যেন লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। আর আমার জন্য আমার নিজের পরিবারের মধ্য হতে একজন সহকর্মী নির্দিষ্ট করে দাও। হারুন যে আমার ভাই, তাঁর সাহায্যে আমার হাত মজবুত কর এবং তাঁকে আমার কাজে শরীক বানিয়ে দাও, যেন আমরা খুব বেশী করে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি তোমার কথা খুব বেশী মাত্রায় চর্চা আলোচনা ও স্মরণ করি। তুমি তো সব সময়ই আমাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিবান থেকেছ। ত্বাহা ২৫-৩৫

হযরত মুসা (আঃ) এর এই দোয়া আল্লাহ তায়ালা সুরায়ে ত্বহার মধ্যে উল্লেখ করেছেন। উক্ত দোয়ায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আমরা পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করতে পারি।

এক ঃ শরহে ছদর। যার শাব্দিক অর্থ বক্ষ সম্প্রসারণ। আর ভাব অর্থ হলো নিজের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা। নিজের আদর্শ ও অর্পিত দায়িত্ব পালনে মনে কোন প্রকারের দ্বিধা দ্বন্দ্ব, কোন রকমের সংকীর্ণতা না থাকা। রাষ্ট্রশক্তির অধিকারী, চরম স্বৈরাচারী এক শাসক। তার ক্ষমতা প্রতিপত্তি সেই সময় সর্বজন বিদিত। তার ধনবল জনবল ও ক্ষমতা প্রতিপত্তির মোকাবেলায় হযরত মুসা (আঃ) এর ন্যায় একজন সহায় সম্বলহীন ব্যক্তিকে তার দরবারে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এই নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য মুসা (আঃ) এর সামনে দুটো বিষয় সন্দেহাতীতভাবে পরিস্কার হওয়া দরকার ছিল।

১। নিজে হকের উপর আছেন এ ব্যাপারে কোন প্রকারের দ্বিধা দ্বন্দ্ব বা অস্পষ্টতা না থাকা এবং এই হক প্রতিষ্ঠা কিভাবে করতে হবে এ সম্পর্কে স্বচ্ছ সুস্পষ্ট ধারণা থাকা।

২। ফেরাউনী শক্তি যে বাতিল শক্তি, আপাত দৃষ্টিতে সে যতই শক্তিধর হোক না কেন পরিণামে তাকে ধ্বংস হতেই হবে এ সম্পর্কেও মনে সুদৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হওয়া।

দুই ঃ তাইছিরে আমর বা কাজকে যথাসাধ্য সহজভাবে আঞ্জাম দিতে প্রয়াস পাওয়া। দায়ী বা ইসলামী নেতৃত্ব যে কোন সময় যে কোন প্রকারের ঝুঁকি নেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে। ঝুঁকি বা বিপদ আপদকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা হিসাবে গ্রহণ করবে। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে ঝুঁকি, পরীক্ষা বা বিপদ মুছিবত কামনা করবে না। বরং নিজের দিক থেকে যথাসাধ্য সহজভাবে, সহজ উপায়ে কাজ সমাধানের প্রয়াস চালাবে এবং সেই প্রয়াসে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে। সুরা বাকারায় আল্লাহ এর সম অর্থবোধক দোয়া শিখায়েছেন ঃ

رَبَّنَا وَلَاتَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَاتُحَمِّلْنَا مَالَاطَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۝

হে আমাদের রব! আমাদের উপর সেই রকম বোঝা চাপিও না যে রূপ বোঝা তুমি পূর্ববর্তী লোকদের উপর চাপিয়েছ। হে আমাদের রব আমাদের উপর এমন বোঝা চাপিও না যা বহনের ক্ষমতা আমাদের নেই। তুমি মাফ কর, রহম কর। তুমিই আমাদের মাওলা, অতএব কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে তুমি আমাদেরকে বিজয় দান কর। আল বাকারাঃ ২৮৬। হাদীসে রাসূলে বলা হয়েছেঃ

لَاتُشَدِّدُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ فَيُشَدِّدُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ

তোমরা নিজেদের উপর কৃত্রিমভাবে কোন কড়াকড়ি আরোপ করো না তাহলে আল্লাহ তোমাদের উপর কড়াকড়ি আরোপ করে বসবেন।

يَسِّرُوْا وَلَاتُعَسِّرُوْا بَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا ۔

দ্বীনের কাজকে মানুষের জন্য যথাসাধ্য সহজ করে পেশ কর। কঠিন করো না। লোকদের সুসংবাদ শুনাও। তাদেরকে বিতশ্রদ্ধ করে ফেল না। (জামউল ফাওয়াএদ)

তিন ঃ হল্লে আকদ। ভাষা জনগণের বোঝার উপযোগী হতে হবে। অবশ্যই দায়ী তার আদর্শের কথাই বলবেন। স্থান কাল পাত্র ভেদে তিনি নীতি বদলাবেন না, কিছু রেখে ঢেকেও বলবেন না। কিন্তু বলবেন এমন ভাবে যাতে করে যাদেরকে বলা হয় তারা সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হয়। নেতাকে জনগণের উদ্দেশ্যেও কথা বলতে হয়, সেক্ষেত্রে কথা জনগণের বুঝবার উপযোগী হয়ে আসতে হবে। কর্মীদেরকে পরিচালনা করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নমুখী হেদায়েত দিতে হয় তাও তাদের বুঝবার মত হয়ে আসতে হবে।

চারঃ বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও অন্তরঙ্গ সাথী সহকর্মী কামনা। এভাবে নিজের দায়িত্ব মজবুত ও সুদৃঢ়ভাবে আঞ্জাম দেবার মত উপায় উপকরণ বের করা এবং তাকে কাজে লাগানো [illegible] রা। অনুরূপ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সাথী হিসাবে হযরত ঈসা (আঃ) পেয়েছিলেন হাওয়ারীদেরকে। শেষ নবী (সঃ) পেয়েছিলেন হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলীর ন্যায় মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে থেকে তাদের অসংখ্য নিবেদিত প্রাণ সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) দেরকে।

পাঁচঃ এই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সাথী সহকর্মী কামনা এবং এ জন্যে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ, নিছক নিজের নেতৃত্ব মজবুত করা বা নিজের প্রতি কিছু লোককে

বংশবাদ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্য হবে না, বরং নেতা ও সহকর্মী সবার লক্ষ্য হবে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বেশী বেশী করে আল্লাহর তাসবিহ পাঠ, জিকির করা যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের যাবতীয় কার্যক্রম আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হয়।

শেষ নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই আমাদের জন্য প্রত্যক্ষ অনুসরণীয় আদর্শ। তাঁর এ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গেলে তো গোটা কোরআনকেই আলোচনা করতে হয়। কারণ গোটা কোরআনই ছিল তাঁর আদর্শ। তিনি হলেন বাস্তব বা জীবন্ত কোরআন, আন্দোলনের মূল নেতা হিসাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর যে যে গুণাবলী বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন তার কিছু অংশ আমরা আলোচনা করবো। সুরায়ে আহযাবে আল্লাহ বলেন ঃ

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا . وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا.

হে নবী আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীস্বরূপ সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে এবং খোদার অনুমতি ক্রমে তাঁর প্রতি আহবানকারী ও উজ্জল প্রদীপ হিসাবে। (তোমার প্রতি) ঈমান গ্রহণকারী লোকদেরকে সুসংবাদ দাও যে তাদের জন্য খোদার তরফ হতে বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে এবং কাফের ও মুনাফেকদের সম্মুখে আদৌ দমে যেও না তাদের নিপীড়নকে মাত্রই পরোয়া করো না, খোদার উপর ভরসা কর, আল্লাহই যথেষ্ট যে, মানুষ সমস্ত ব্যাপারে তাঁরই উপর সোপর্দ করে দিক। আল আহযাব ঃ ৪৫-৪৮

উল্লেখিত আয়াত কটিতে মানুষের নেতা হিসাবে সর্বকালের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ নেতার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে নিম্নোক্ত জিনিসগুলো আমরা অনুধাবন করতে পারি।

একঃ তিনি শাহেদ। সত্যের সাক্ষ্য দাতা। বাস্তবে নমুনা পেশ করে সাথী সঙ্গীদের দ্বীনের পথে পরিচালনা করেন। দ্বীনের তালিম দেন। কেবল মুখের নছিহত বা নির্দেশের মাধ্যমে নয়।

দুইঃ তিনি মুবাশশির। শুভ সংবাদ দাতা। আল্লাহর দ্বীন কবুল করে অনুসরণ করে মানুষ দুনিয়ায় ও আখেরাতে কি কি কল্যাণ পাবে এ ব্যাপারে মানুষকে অবহিত করা তার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব তিনি কাঠখোট্টাভাবে পালন না করে দরদপূর্ণভাবে উপস্থাপন করেন। ফলে মানুষ, তাঁর সাথী সঙ্গীগণ যজবা উৎসাহ উদ্দীপনা ও স্বত:স্ফূর্ত প্রেরণা অনুভব করে।

তিনঃ তিনি নাজির। আল্লাহর দ্বীন বর্জন করার অমান্য করার পরিণামে দুনিয়ার কি কি অসুবিধা আছে, আখেরাতে কি কি কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে এ ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক বা সাবধান করা তার অন্যতম কাজ। এভাবে শুভ সংবাদ দান ও সতর্ককরণের মতো দুটো কাজ একত্রে করার ফলশ্রুতিতে গড়ে উঠে অদ্ভুত এবং নজীরবিহীন ভারসাম্য পূর্ণ চরিত্র। মানুষের সমাজ পরিচালনার জন্য যা একান্তই অপরিহার্য।

চারঃ তিনি দায়ী ইলাল্লাহ। তার আন্দোলন সংগঠন, তাঁর পরিচালনা পরিবেশনা সব কিছুর সারকথা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা। সুরায়ে ইউসুফে তো এটাকেই একমাত্র কাজ বা প্রধানতম কাজ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ

বল এটাই আমার পথ যে, আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই।

উল্লেখিত চারটি বৈশিষ্ট্যময় গুণের বর্ণনা আসছে- নবীর পরিচয়, তাঁর কাজের পরিচয় হিসাবেই। দ্বিতীয় গুণের প্রয়োগের জন্যে নির্দেশ আসছে মুমিনদেরকে এই মর্মে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় ধরনের অনুগ্রহ অপেক্ষা করছে। আর প্রথমগুলোর প্রয়োগ হিসাবে নির্দেশ আসছে কাফের এবং মুনাফিকদের কাছে কখনও নতি স্বীকার করবে না, তাদের জুলুম নির্যাতনের কোনই পরোয়া করবে না। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর। এভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করাই যথেষ্ট।

সুরায়ে তওবায় শেষ দটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ . فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

দেখ তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন রাসূল এসেছেন তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া তার জন্য খুবই কষ্টদায়ক। তোমাদের কল্যাণের ব্যাপারে তিনি খুবই আগ্রহী (তোমাদের কল্যাণ তার কাছে খুবই লোভনীয়) ঈমানদারদের জন্যে তিনি বড়ই সংবেদনশীল এবং দয়ালু। এখন যদি এরা আপনার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে হে নবী, আপনি তাদের বলে দিন, আল্লাহই আমার জন্যে যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাঁর উপরই আমি ভরসা করছি। তিনি তো আরশে আজিমের মালিক। আত তাওবা ঃ ১২৮ -১২৯

সুরায়ে আলে ইমরানে আল্লাহর রাসূলকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ.

হে নবী, এটা আল্লাহ তায়ালার বড় মেহেরবানী যে, আপনি তাদের জন্যে খুবই নরম দিলের পরিচয় দিতে পারছেন। এ না হয়ে যদি আপনি কড়া মেজাজের মানুষ হতেন, আর আপনার দিল পাষাণ হত, তাহলে এরা সব আপনার নিকট থেকে দূরে সরে যেত। তাদের ভুলত্রুটি মাফ করে দিন- আল্লাহর কাছেও তাদের জন্যে ক্ষমা চেয়ে দোয়া করুন এবং দ্বীনের কাজে তাদের সাথেও পরামর্শ করুন। যদি কোন ব্যাপারে আপনি স্থির সিদ্ধান্তে পৌছতে সক্ষম হন, তাহলে সে ব্যাপারে আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আল্লাহ তো সেই সব লোকদেরকেই পছন্দ করেন যারা তারই উপর ভরসা রাখে। তাঁরই উপর ভরসা করে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা ও সমাধা করে। আলে ইমরান ঃ ১৫৯

সুরা তওবার শেষ আয়াতটির আলোকে রাসূলের পরিচয় ১) মানুষের দুঃখ কষ্ট তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন। শুধু তাই নয় কিসে কষ্ট লাঘব হতে পারে, কষ্ট দূর হতে পারে, সেই চিন্তা নিয়ে তিনি পেরেশান ও ব্যস্ত থাকেন। ২। কিসে মানুষের কল্যাণ হতে পারে, কিসে মানুষের জীবন ইহকালে ও পরকালে সুখ-শান্তি ও কল্যাণ হতে পারে সদা সেই চিন্তা ও ভাবনা পোষণ করেন। মানুষের কল্যাণই তাঁর বড় আগ্রহের ব্যাপার, কারণ তিনি রহমাতুল্লিল আলামীন (৩) মুমিনদের প্রতি বিশেষ ভাবে তিনি দয়া পরবশ এবং দরদী মনের

অধিকারী। ৪। এভাবে দরদী মনের মানুষ সাধারণত: দুর্বলচেতা হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহর রাসূল এবং রাসূলের মাধ্যমে তাঁর উম্মত ও উম্মতের মধ্য থেকে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা একটা বেপরোয়া মনোভাবের সৃষ্টি করে দেয়। ফলে এই দরদী মনের লোকেরাও প্রয়োজনে গোটা দুনিয়ার সমস্ত শক্তির বিরোধিতাকেও পরোয়া করে না। সারা দুনিয়া একদিকে হলেও তাদের মনের দৃঢ়তার কোন ভাটা পড়ে না।

সুরায়ে আলে ইমরানের বর্ণনাতেও এর কাছাকাছি বক্তব্যই এসেছে। ১। দিল অত্যন্ত নরম ও কোমলতায় পরিপূর্ণ, ২। তার হৃদয় পাষাণ নয়, মেজাজ কড়া বা রুক্ষ নয়, ৩। সাথীদের প্রতি নিজেও ক্ষমা প্রদর্শন করবে, আল্লাহর কাছেও তাদের জন্যে ক্ষমা চাইবে। ৪। তাদের সাথে পরামর্শ করবে। ৫। কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দৃঢ় পদক্ষেপ নেবে, দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দেবে। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের ফলে এক অনড়-অবিচল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবে।

সুরায়ে ফাতহের শেষ দিকে আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর সাথীদের অর্থাৎ নেতা ও কর্মীদের কয়েকটি বিশেষ গুণের বর্ণনা এক সাথেই করেছেন এবং এই গুণগুলোর বর্ণনা করেছেন দ্বীন বিজয়ী হবেই- এমন একটা ঘোষণার সাথে সাথেই বলা হয়েছে।

هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا. مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ.

তিনি তো আল্লাহই যিনি রাসূল পাঠিয়েছেন হেদায়েত ও দ্বীনে হক সহকারে যাতে তাকে সমস্ত দ্বীন সমূহের উপর বিজয়ী করতে পারে। এ ব্যাপারে আল্লাহর সাক্ষ্য যথেষ্ট। মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথী সঙ্গীগণ কাফেরদের মোকাবিলায় কঠোর এবং পরস্পরের প্রতি রহম দিল। যখনই

তাদের দেখতে পাবে তারা হয় রুকু সেজদা বা আল্লাহর ফজল এবং রেজামুন্দি তালাশে নিয়োজিত আছে। তাদের চেহারায় সেজদার ছাপ বিদ্যমান যা দ্বারা তাদের সহজেই চেনা যায়। আল ফাতহ ঃ ২৮-২৯

এখানে কঠোর কমলের অদ্ভুত সমাবেশ। এমন দুটি বিপরীতমুখী গুণের সফল প্রয়োগ সীমা লংঘন না করা, ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব একমাত্র আল্লাহর সাহায্যেই। তাই তো এই গুণের অধিকারী নেতা কর্মী সবাই আল্লাহর সমীপে সেজদায় অবনত হয়ে অনবরত তাঁর ফজল সন্তুষ্টির কামনায় ব্যস্ত ও নিয়োজিত থাকে।

আল কোরআন উপরের যেসব গুণের কথা আলোচনা করেছে মুহাম্মদ (সঃ) ইসলামী কাফেলার নেতা হিসাবে ঐ সবের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। ইসলামী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের সাধ্যমত এই উসওয়ায়ে হাসানার সফল অনুসরণের প্রয়াস পেতে হবে।

হাদীসে রাসূলের আলোকে নেতৃত্বের গুণাবলী

عَنْ عَوْفِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خِيَارُكُمْ اَئِمَّتُكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ اَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ تَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا نُنَابِذُهُمْ قَالَ لَا مَا اَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلٰوةَ لَا مَا اَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلٰوةَ.

হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি তোমাদের নেতারাই উত্তম নেতা যাদেরকে তোমরা ভালোবাস এবং তারা তোমাদেরকে ভালোবাসেন। তোমরা তাদের জন্য দোয়া করো আর তারা তোমাদের জন্যে দোয়া করে। আর তোমাদের ঐ সব নেতারাই নিকৃষ্ট নেতা যাদের প্রতি তোমরা বিক্ষুব্ধ এবং তারাও তোমাদের প্রতি বিক্ষুব্ধ। হযরত আওফ বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, তাদেরকে কি

আমরা পদচ্যুত করতে পারবো না? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মাঝে নামাজ কায়েম করবে না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মাঝে নামাজ কায়েম করবে।

اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا وَلّٰى عَلَيْهِمْ حُلَمَاءَهُمْ وَقَضٰى بَيْنَهُمْ عُلَمَاءَهُمْ وَجَعَلَ الْمَالَ فِيْ سُمَحَاءِهِمْ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ شَرًّا وَلّٰى عَلَيْهِمْ سُفَهَاءَهُمْ وَقَضٰى بَيْنَهُمْ جُهَّالَهُمْ وَجَعَلَ الْمَالَ فِيْ بُخَلَائِهِمْ.

আল্লাহ যখন কোন জাতির কল্যাণ চান তখন তাদের উপর সহনশীল লোকদের নেতৃত্ব দান করনে তাদের মধ্যকার বিচার ব্যবস্থার দায়িত্বজ্ঞানী লোকদের উপর অর্পণ করেন এবং অর্থ-সম্পদ দান করেন দানশীল লোকদেরকে। আর যখন কোন জাতির অকল্যাণ চান তখন তাদের উপর নির্বোধ লোকদের নেতৃত্ব চাপিয়ে দেন। তাদের মধ্যে বিচার ফয়সালার দায়িত্ব অজ্ঞ লোকদের উপর অর্পণ করেন এবং ধনসম্পদ দান করেন কৃপণ লোকদের হাতে। (দায়লামী)

عَنْ عَائِذِبْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ زِيَادٍ فَقَالَ لَهُ اَيْ بُنَيَّ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ فَاِيَّاكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ - (متفق عليه)

হযরত আয়েজ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ আমার কাছে এসে বললেন, বাপু হে শোন। আমি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি নিকৃষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তি হল রাগী বদমেজাজী ব্যক্তি (অর্থাৎ পাষাণ দিলের মানুষ যে তার অধীনস্থ লোকদের উপর শুধু জুলুম করে, তাদের সাথে কখনো নরম ব্যবহার করে না, দরদ দেখায় না)

খবরদার আমি তোমাকে সাবধান করছি- তুমি যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত না হও। (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِيْ بَيْتِيْ هٰذَا اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِيْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِيْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ. (رواه مسلم)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি আমার ঘরে আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি (তিনি এই বলে দোয়া করেছেন) হে আল্লাহ, আমার উম্মতের কোন সামষ্টিক কার্যক্রমের কোন বিষয়ে যদি কেউ দায়িত্বশীল নিযুক্ত হয় অতপর তাদের প্রতি কঠোর আচরণ করতে থাকে- তা হলে তুমি তার প্রতি কঠোর আচরণ করবে। আর যদি কেউ আমার উম্মতের কোন বিষয়ের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাদের সাথে নরম ব্যবহার করে তাহলে তুমিও তাদের সাথে নরম ব্যবহার করবে। (মুসলিম)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْاَمْرِ كُلِّهِ. (متفق عليه)

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ নরম আচরণকারী এবং যাবতীয় কার্যক্রমে তিনি নরম আচরণই পছন্দ করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

وَعَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ يُعْطِيْ عَلَى الرِّفْقِ مَالَا يُعْطِيْ عَلَى الْعُنْفِ وَمَالَا يُعْطِيْ عَلَى مَا سِوَاهُ. (متفق عليه)

হযরত আয়েশা (রাঃ) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ দরদী- তিনি দরদপূর্ণ আচরণই পছন্দ করেন। তিনি দরদপূর্ণ আচরণের বিনিময়ে এমন কিছু দিয়ে থাকেন যা রাগী বদমেজাজী লোকদেরকে কখনও দেন না। এমন কি আল্লাহ তার ঐ বিশেষ দান বিশেষ অনুগ্রহ আর কোন কিছুর বিনিময়েই দেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ. (رواه مسلم)

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নরম ব্যবহার বা দরদপূর্ণ ব্যবহার থেকে বঞ্চিত সে প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত। (মুসলিম)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَمْرَيْنِ قَطُّ اِلَّا اَخَذَ اَيْسَرَهُمَا مَالَمْ يَكُنْ اِثْمًا فَاِنْ كَانَ اِثْمًا كَانَ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ اِلَّا اَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ تَعَالٰى. (متفق عليه)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট কোন দুটি কাজের মধ্যে একটি বাছাই করার এখতিয়ার যদি দেয়া হত তাহলে তিনি অপেক্ষাকৃত সহজটাই গ্রহণ করতেন, যদি না সেটা কোন গোনাহের কাজ হত। যদি কোন গোনাহর কাজ হত তাহলে তিনি ছিলেন তা থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থানকারী।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনও ব্যক্তিগত স্বার্থে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। হ্যাঁ যদি কখনও আল্লাহপাকের নিষিদ্ধকৃত কোন ব্যাপারে কেউ জড়িয়ে পড়েছে আল্লাহ প্রদত্ত সীমালংঘনের প্রয়াস পেয়েছে তখন তিনি নিছক আল্লাহর জন্যেই প্রতিশোধ নিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسِّرُوْا وَلَاتُعَسِّرُوْا بَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا (متفق عليه)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, সহজ কর, কঠিন কর না, সুসংবাদ দাও... বিতশ্রদ্ধ কর না। (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصِنِىْ . قَالَ " لاَتَغْضَبْ " فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لاَتَغْضَبْ. (رواه البخارى)

হযরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসুল (সাঃ) কে বলল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন- উত্তরে রাসুল (সাঃ) বললেন, রাগ করবে না, একথা কয়েক বার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, রাগান্বিত হবে না। (বুখারী)

لاَيَنْبَغِىْ لِلرَّجُلِ اَنْ يَاْمُرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ حَتّٰى يَكُوْنَ فِيْهِ ثَلاَثُ خِصَالٍ . رَفِيْقٌ بِمَا يَاْمُرُ رَفِيْقٌ بِمَا يَنْهٰى عَالِمٌ بِمَا يَنْهٰى عَدْلٌ فِيْمَا يَنْهٰى . (الديلمى)

তিনটি গুণের অধিকারী না হয়ে কোন ব্যক্তির আমর বিল মারুফ এবং নেহী আনেল মুনকারের কাজে আত্মনিয়োগ করা উচিত নয়। গুণ তিনটি এই ঃ (১) যাকে হুকুম দিবে বা নিষেধ করবে তার প্রতি দরদী সংবেদনশীল হতে হবে। (২) যে ব্যাপারে নিষেধ করবে সে বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হবে। (৩) যে ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করবে- সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ইনসাফ করতে সক্ষম হতে হবে। -দায়লামী, মিনহাজুস সালেহীন।

اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَاعِظًا مِّنْ نَفْسِهِ يَاْمُرُهُ وَيَنْهَاهُ. (الدَّيْلَمِى)

যখন আল্লাহ তার কোন বান্দার কল্যাণের সিদ্ধান্ত নেন- তখন তার মনকে তার জন্যে নছিহতকারী বানিয়ে দেন, মনই তাকে ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করে আর খারাপ কাজে বাধা দান করে। অথবা এর অর্থ এও হতে পারে যে, সে ভাল কাজের উপর আমল করে খারাপ কাজ বর্জন করে নমুনা পেশ করে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়। (মিনহাজুস সালেহীন)

রাসূল পাক (সাঃ) থেকে অনুরূপ আরও বহু নছিহতপূর্ণ হাদীস রয়েছে। আল্লাহর কোরআনে তাঁর যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে তিনি বাস্তব জীবনে নিজে এর চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন এবং তার সাথী সংগীদের মাধ্যমে যুগ যুগান্তরের মানুষের জন্যে সেই উত্তম আখলাকের কথা পৌছাবার, এর উপর আমল করার তাগিদ করেছেন। আমাদের সমাজে একটা ভুল ধারণা কাজ করছে যে, নেতৃস্থানীয় লোকদের ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতিই হয় না একটু মেজাজ না দেখালে। তাই সাধারণত: ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকদেরকে বদমেজাজী দেখা যায় অথবা বদমেজাজী লোকদেরকে ভুলে আমরা ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হিসাবে গণ্য করে আসছি। রাসূলের (সাঃ) চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের কোন পরিচয় কারও জানা আছে কি? কেবল দ্বীনী বিচারেই নয় দুনিয়ার যে কোন মানদণ্ডেও তো তিনি সর্বকালের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। এই তো মাত্র সেদিন আমেরিকার জনৈক লেখক দুনিয়ার সেরা একশত ব্যক্তিত্বের উপর গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে রাহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মদ (সাঃ) কেই শীর্ষস্থান দিতে বাধ্য হয়েছেন।

ইসলামী হুকুমাতের নেতা বা কোন দায়ীত্বশীল হোক বা ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের দায়িত্বশীলই হোক তাকে রাহমাতুল্লিল আলামীনের প্রতিনিধিত্ব মানতে হবে। সুতরাং তার সামনে ব্যক্তিত্বের মডেল হিটলার মুসোলিনী তো হতেই পারে না- রহমতের প্রতীক দয়ামায়ার মূর্ত প্রতীক মুহাম্মদ (সাঃ) ই হতে হবে। তাঁর শ্রেষ্ঠ সাথী মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ) এর সম্পর্কে আমরা কি মূল্যায়ন করব। স্বয়ং মুহাম্মদ (সাঃ) এর ভাষায় ঃ

اَرْحَمُ اُمَّتِىْ اَبُوْبَكْرًا

আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দয়াশীল হল আবুবকর (রাঃ)।

নবী রাসূলগণের পরে এই শ্রেষ্ঠ মানুষটি রহম দিল। সবচেয়ে বেশী রহম দিল হওয়া সত্ত্বেও তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব কোথাও ক্ষুন্ন হয়েছে কি? রাসূল (সাঃ) এর ওফাতের পরবর্তী পরিস্থিতিতে তিনি কি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেননি? ভণ্ড নবীদের দমন করার ব্যাপারে, যাকাত অস্বীকারকারীদের সমুচিত শিক্ষা দেবার ব্যাপারে তিনি কি বলিষ্ঠতার পরিচয় দেননি?

হ্যাঁ, হযরত ওমর (রাঃ) অপেক্ষাকৃত শক্ত মনের ছিলেন। কিন্তু তিনি শক্ত ছিলেন আল্লাহর আদেশ নিষেধের ব্যাপারেই-

اَشَدُّ هُمْ فِىْ اَمْرِ اللّٰهِ.

তবুও এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, তার খেলাফতের প্রস্তাবের সময় এই কঠোরতার জন্যে আপত্তি উঠেছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেছিলেন, দায়িত্ব আসলে ঠিক হয়ে যাবে। দায়িত্ব পেয়েই তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করতে গিয়ে কাতর কণ্ঠে বলেছিলেন- আল্লাহ আমার দিলকে নরম করে দাও। খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ইতিহাসের এই কঠোর ব্যক্তিত্বও জনসাধারণের প্রতি আচরণে দরদী মনের পরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।

ঐ বাঞ্ছিত গুণাবলী অর্জনের উপায় ঃ

আল কোরআনে স্বয়ং আল্লাহর রাসূলের যেসব গুণের কথা বলা হয়েছে, হাদীসে রাসূলের তাগিদ অনুযায়ী- তাঁর উম্মতের এবং উম্মতের বিভিন্নমুখী কার্যক্রম পরিচালনা যারা করবে, তাদের মাঝে গুণ সৃষ্টির তাগিদ আল্লাহর রাসূল দিয়েছেন- সেই গুণ সৃষ্টি করার উপায় কি? এ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে হয়। আল্লাহ স্বয়ং তার রাসূল (সাঃ) কে যে রেসালতের দায়িত্ব পালনের জন্যে যোগ্যতা অর্জন করার প্রস্তুতি গ্রহণ করার যে হেদায়াত দান করেছিলেন, তার অনুসরণই এর উত্তম বরং একমাত্র উপায়। আল্লাহ তায়ালার এই হেদায়েত আমরা পাই সুরায়ে মুদ্দাসসিরের প্রথম সাত আয়াতে এবং সুরায়ে মজাম্মিলের প্রথম রুকুতে। মুদ্দাসসিরের প্রথম সাত আয়াতের শিক্ষণীয় দিক হলো ১। দ্বিধা সংকোচ ও জড়তা কাটিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে মাঠে ময়দানে দায়িত্ব পালনে

নিয়োজিত হতে হবে। ২। মানবজাতিকে খোদাহীন সমাজ ব্যবস্থা সভ্যতা সংস্কৃতির পরিণাম ও পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক-সাবধান করার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। ৩। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে বর্তমান অবস্থা পরিবর্তনের আহবান জানাতে হবে। ৪। এ কঠিন দায়িত্ব পালনের জন্যে দায়ীর ব্যক্তিত্ব আকর্ষণীয় হতে হবে। আর সে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব গড়ার উপায় হিসাবে বাহ্যিক ও আত্মিক উভয় দিক দিয়ে পাক-পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করতে হবে। শারীরিক দিক দিয়ে পোশাক-পরিচ্ছদের দিক দিয়ে এবং আচার ব্যবহার, আমল আখলাকের দিক দিয়েও পূত পবিত্রতার অধিকারী হতে হবে। ৫। আল্লাহর আজাবের কারণ ঘটায় এমন সব কাজ বর্জন করে চলতে হবে। এ ব্যাপারে সদা সতর্ক সাবধান থাকতে হবে। ৬। সৃষ্টি জগতে কারও কাছে কোনদিন কোন প্রতিদানের আশায় কোন কাজ করা যাবে না। ৭। রবের জন্য ধৈর্য্য ধারণ করবে।

সুরায়ে মুজাম্মেলের প্রথম রুকুর শিক্ষণীয় দিকগুলো নিম্নরূপ ঃ ১। আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে রাত্রের কিছু অংশ (এক তৃতীয় অংশ, অর্ধেক বা তার কিছু কম বেশী) জাগার অভ্যাস গড়ে তুলবে। ২। আল্লাহর কিতাবের সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়াবার জন্যে বুঝে বুঝে ধীরে ধীরে কুরআন অধ্যয়ন বা তেলাওয়াত করবে। এই তেলাওয়াত নামাযের মাধ্যমেও হতে পারে নামাযের বাইরে হতে পারে। ৩। দিনের ব্যস্ততার মধ্যেও আল্লাহর জিকির করবে। ৪। দুনিয়ার সবকিছু থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে একমাত্র আল্লাহর দিকে রুজু হবার প্রয়াস চালাবে। ৫। যেহেতু আল্লাহ মাশরিক ও মাগরিবের রব, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। অতএব একমাত্র তার উপর ভরসা করবে, একমাত্র তাকেই অভিভাবক বানাবে। ৬। প্রতিপক্ষের, বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতার, সমালোচনার মুকাবিলায় ধৈর্য্য ধারণ করবে। ৭। উত্তম আখলাকের মাধ্যমে তাদেরকে এড়িয়ে চলবে। ৮। বিরোধিতার নায়কদেরকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করবে।

নেতত্বের মৌলিক দায়িত্ব ঃ

ইসলামী নেতৃত্ব যেহেতু রাসূলের প্রতিনিধিস্থানীয় মর্যাদার অধিকারী, সুতরাং তার মৌলিক দায়িত্ব সেটাই যা আল্লাহর রাসূলকে আঞ্জাম দিতে হয়েছে। আল্লাহর রাসূলের মৌলিক কাজ কোরআন মজিদের তিনটি জায়গায় একই ভাষায় এসেছে ঃ

সুরা বাকারায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া হিসেবে-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

হে খোদা। এদের প্রতি এদের জাতির মধ্য হতে এমন একজন রাসুল প্রেরণ কর যিনি তাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করবেন এবং তাদের বাস্তব জীবনকে পরিশুদ্ধ ও সুষ্ঠুরূপে গড়বেন। তুমি নিশ্চয়ই বড় শক্তিমান ও বিজ্ঞ। - বাকারা ১২৯

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

তিনিই যিনি উম্মীদের মধ্যে একজন রাসুল স্বয়ং তাদেরই মধ্য হতে দাঁড় করিয়েছেন যিনি তাদেরকে তার আয়াত শোনান তাদের জীবন পরিশুদ্ধ ও সুগঠিত করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। সুরা জুমআ ঃ ২

উক্ত আয়াতগুলোর আলোকে রাসূলের মৌলিক কাজ হিসাবে আল্লাহ চারটি কাজের কথা উল্লেখ করেছেন। ১। তেলাওয়াতে আয়াত ২। আল্লাহর কিতাবের তালিম ৩। হেকমতের তালিম ৪। তাজকিয়ায়ে নফস।

আজকের দিনে নায়েবে রাসূলের দায়িত্ব পালন যারা করতে চান তাদেরকেও রাসূল (সঃ) এর পক্ষ থেকেই ঐ দায়িত্ব সমূহ আঞ্জাম দিতে হবে। যত পরিকল্পনা, যত কর্মসূচী, যত কর্ম কৌশলই গ্রহণ করা হোক না কেন তা এই মৌলিক কাজ সম্পাদনের জন্যই করতে হবে যার স্বাভাবিক দাবী সংগঠনের আওতাভুক্ত লোকদের ঈমানের তারাক্কির ব্যবস্থা করা, কোরআন সুন্নাহর শিক্ষা সমূহের বাস্তব প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের ব্যবস্থা করা, সর্বোপরি তাদের আমল আখলাক উন্নত করার, আত্মশুদ্ধি ও আত্মিক উন্নতি লাভের ব্যবস্থা করা। এভাবে আল কোরআনের বাঞ্ছিত মান অনুযায়ী লোক তৈরী করতে পারাই একজন সংগঠকের প্রকৃত সফলতা।

নেতা ও কর্মীর সম্পর্কঃ

ইসলামী সংগঠনের নেতা ও কর্মীর সম্পর্ক বস ও সাবোর্ডিনেটের সম্পর্ক নয়, বা অফিসার ও কর্মচারীর সম্পর্ক নয়। এ সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বের। নেতা ও কর্মীকে ভ্রাতৃত্বের দাবী নিয়ে, দরদ নিয়ে, আবেগ অনুভূতি নিয়ে পরিচালনা করবে। কর্মী ও নেতাকে ভ্রাতৃতূল্য ভক্তি শ্রদ্ধা সহ গ্রহণ করবে। আমরা বস ও নেতাদের মধ্যে কথা কাজে আচার আচরণে নিম্নোক্ত পার্থক্য দেখতে পাই ঃ

১। বস সাধারণত মেজাজ দেখিয়ে লোকদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে, আর নেতা তাদেরকে নম্র ব্যবহারের মাধ্যমে কাছে টানে।

২। বস সাধারণত আইনের ও কর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল থাকে, আর নেতা নির্ভর করে তার প্রতি কর্মী ও সাথী সঙ্গীদের শুভেচ্ছা ও শুভ ধারণার উপর।

৩। বস তার অধিনস্থদের মনে তার সম্পর্কে এক ধরনের ভীতির ভাব সৃষ্টি করে তাদেরকে সন্ত্রস্ত করে রাখে- কিন্তু নেতা তার সহকর্মী ও সাথীসঙ্গীদের মনে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

৪। বসের মধ্যে আমিত্বের প্রাধান্য থাকে এবং তার কথাবার্তায় আমি আমি শব্দ বেশী বেশী উচ্চারিত হয়। নেতা সকলকে সাথে নিয়ে কথা বলেন, কাজ করেন, তাই তার কথায় আমির পরিবর্তে আমরা উচ্চারিত হয়ে থাকে।

৫। বস তার অধীনস্থদের যেখানে সময় মত আসার নির্দেশ দেয় সেখানে নেতা সময়ের আগে উপস্থিত হয়।

৬। বস অধীনস্থদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে থাকে। আর নেতা অভিযোগ না এনে অচলাবস্থা নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৭। বস কাজটা কিভাবে করতে হবে বলে দিয়েই দায়িত্ব শেষ মনে করে। আর নেতা কাজটা কিভাবে করতে হয় তা বাস্তবে দেখিয়ে দেয়।

৮। বস সাধারণত কাজের ব্যাপারে একঘেয়েমি সৃষ্টি করে থাকে যার ফলে সহজ কাজও অনেক ক্ষেত্রে কঠিন মনে হয়। আর নেতা কঠিন কাজকে সহজ করে ফেলে সহকর্মীদের মনের আবেগ অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে।

৯। কাজ শেষে বিদায়ের মুহূর্তে বস যেখানে বলবে তোমরা বা আপনারা চলে যান, সেখানে নেতা বলবে চলুন আমরা যাই বা এবার আমরা যেতে পারি।

পঞ্চম অধ্যায়

আনুগত্য

আনুগত্য কাকে বলে ঃ

আনুগত্য অর্থ মান্য করা, মেনে চলা, আদেশ ও নিষেধ পালন করা, উপরন্তু কোন কর্তৃপক্ষের ফরমান ফরমায়েশ অনুযায়ী কাজ করা প্রভৃতি। আল কোরআনে এবং হাদীসে রাসূল-এর প্রতিশব্দ হিসাবে আমরা যেটা পাই সেটা হল এতায়াত। এতায়াতের বিপরীত শব্দ হল মাছিয়াত বা এছইয়ান। যার অর্থ নাফরমানী করা, হুকুম অমান্য করা প্রভৃতি।

প্রকৃত আনুগত্য বা প্রকৃত এতায়াত হল সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর যাবতীয় হুকুম আহকাম মেনে চলা। এটাই মানুষের একমাত্র দায়িত্ব কর্তব্য এবং করণীয় কাজ যা ইবাদত নামেই অভিহিত। এই প্রকৃত এতায়াতের ব্যবহারিক রূপ হল ঃ

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ

আল্লাহর এতায়াত কর, রাসূলের এতায়াত কর এবং উলিল আমরের এতায়াত কর। আন নিসা ৫৯

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ أَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي (متفق عليه)

যে আমার এতায়াত বা আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে আমার হুকুম অমান্য করল সে আল্লাহর হুকুমই অমান্য করল। যারা আমীরের আনুগত্য করল তারা আমার আনুগত্য করল। আর যারা আমীরের আদেশ অমান্য করল সে প্রকৃতপক্ষে আমারই আদেশ অমান্য করল। (বুখারী, মুসলিম)

উপরে উল্লেখিত কোরআনের ঘোষণা এবং হাদীসে রাসূলের আলোকে পরিষ্কার বুঝা যায়- আল্লাহর আনুগত্য রাসূলের মাধ্যমে। আর আল্লাহ ও রাসূল

উভয়ের আনুগত্য উলিল আমর বা আমীরের মাধ্যমে। তবে আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য শর্তহীন এবং নিরঙ্কুশ, উলিল আমর বা আমীরের আনুগত্য শর্ত সাপেক্ষ এবং আল্লাহ ও রাসূল প্রদত্ত সীমারেখার মধ্যে সীমিত।

ইসলামের সাথে আনুগত্যের সম্পর্ক ঃ

ইসলাম ও আনুগত্য অর্থের দিক দিয়ে এক ও অভিন্ন, তেমনি দ্বীন এবং এতায়াতও অর্থের দিক দিয়ে একটা অপরটার সাথে ওতপ্রতভাবে জড়িত।

ইসলামের শাব্দিক অর্থও তাই আনুগত্য বা আত্মসমর্পণ করা, এতায়াত শব্দের অর্থও তাই। এভাবে দ্বীন শব্দটার চারটি অর্থ আছে তার একটি আনুগত্য বা এতায়াত। দ্বীন ও ইসলাম যে বৃহত্তর আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থা উপস্থাপন করে, সেই আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থার মধ্যে দ্বীন ও ইসলামের আভিধানিক অর্থের ধাতুগত অর্থের, ছাপ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এ শাব্দিক অর্থের আলোকে দ্বীনের এবং ইসলামের অন্তর্নিহিত দাবী অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে এখানে আনুগত্যই মূল কথা। সুতরাং আমরা এটা বলতে পারি, ইসলামই আনুগত্য অথবা আনুগত্যই ইসলাম। দ্বীনের অপর নাম আনুগত্য। আনুগত্যেরই অপর নাম দ্বীন। যেখানে আনুগত্য নেই সেখানে দ্বীন নেই, ইসলাম নেই। যেখানে ইসলাম নেই, দ্বীন নেই, সেখানে আনুগত্য নেই। যার মধ্যে আনুগত্য নেই, বাহ্যত সে ইসলামের যত বড় পাবন্দই হোক না কেন, যতই দ্বীনদার হোক না কেন তার মধ্যে দ্বীন নেই, ইসলাম নেই। কারণ আনুগত্যই দ্বীন ইসলামের প্রাণসত্তা।

আনুগত্যের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা ঃ

কোরআনের ঘোষণা

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (الشعراء : ١٥٠) (আশ -শু আরা ঃ ১৫০)

আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। এখানে আল্লাহকে ভয় করে চলার ও তাঁর পছন্দনীয় পথে জীবন যাপন করার জন্যে রাসূলের আনুগত্যকে অপরিহার্য করা হয়েছে। আর এ দুটো শব্দ বিশিষ্ট নির্দেশ অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় কর, আমার আনুগত্য কর। মক্কার সুরাগুলোতে বার বার এসেছে।

কোরআনে হাকীমের আরও ঘোষণা ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلاً

হে ঈমানদারগণ, আনুগত্য কর খোদার, আনুগত্য কর রাসূলের এবং সেসব লোকেরও যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্ন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যাপারে মত বিরোধের সৃষ্টি হয় তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও যদি তোমরা প্রকৃতই খোদা ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক। এটাই সঠিক কর্মনীতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও এটাই উত্তম। আন নিসা ঃ ৫৯

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا

ঈমানদার লোকদের কাজতো এই যে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ডাকা হবে- যেমন রাসূল তাদের মামলা-মুকদ্দমার ফয়সালা করে দেয় তখন তারা বলে ঃ আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। - আন নূর ঃ ৫১

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ

কোন মুমেন পুরুষ ও কোন মুমেন স্ত্রীলোকেরও এই অধিকার নাই যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে ফয়সালা করে দেবে, তখন সে নিজেই সেই ব্যাপারে কোন ফয়সালা করবার ইখতিয়ার রাখবে। - আহযাব ঃ ৩৬

এখানে লক্ষণীয় এই এতায়াতকে আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমানের অনিবার্য দাবী হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

হাদীসে রাসূলে বলা হয়েছে ঃ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ اِلاَّ اَنْ يُّؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ . (متفق عليه).

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, মুসলমানদের উপর নেতার আদেশ শোনা ও মানা অপরিহার্য কর্তব্য। চাই সে আদেশ তার পছন্দনীয় হোক আর অপছন্দনীয় হোক। তবে হ্যাঁ যদি আল্লাহর নাফরমানী মূলক কোন কাজের নির্দেশ হয় তবে সেই নির্দেশ শোনা ও মানার কোন প্রয়োজন নেই। বুখারী ও মুসলিম।

عَنْ اَبِى الْوَلِيْدِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى اَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى اَنْ لاَّتُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهُ اِلاَّ اَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْهِ بُرْهَانٌ وَعَلَى اَنْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ اَيْنَمَا كُنَّا لاَنَخَافُ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ. (متفق عليه)

হযরত আবু অলিদ ওবাদা ইবনে ছামেত বলেন, আমরা নিম্নোক্ত কাজগুলোর জন্য রাসূলের কাছে বায়াত গ্রহণ করেছিলাম ঃ ১। নেতার আদেশ মনযোগ দিয়ে শুনতে হবে- তা দুঃসময়ে হোক আর সুসময়েই হোক। খুশীর মুহূর্তে হোক অখুশীর মুহূর্তে হোক। ২। নিজের তুলনায় অপরের সুযোগ সুবিধাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ৩। ছাহেবে আমরের সাথে বিতর্কে জড়াবে না, তবে হ্যাঁ যদি নেতার আদেশ প্রকাশ্য কুফরীর শামিল হয় এবং সে ব্যাপারে

আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যথেষ্ট দলিল প্রমাণ থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। ৪। যেখানে যে অবস্থাতেই থাকি না কেন হক কথা বলতে হবে। আল্লাহর পথে কোন নিন্দুকের ভয় করা চলবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

এভাবে আল কোরআন এবং হাদীসে রাসূল (সঃ) এর আলোকে আনুগত্যের যে গুরুত্ব এবং অপরিহার্যতা আমরা বুঝতে পারি মানুষের সমাজ জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমনকি প্রাণীজগতেও এর বাস্তবতার ও যথার্থতার প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র একটা পরিবার থেকে শুরু করে বিভিন্নমুখী প্রতিষ্ঠানের গঠনমুখী কার্যক্রম প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদের আনুগত্যের উপরই নির্ভরশীল। বিশেষ করে যে কোন আন্দোলনের, সংগঠনের জন্য আনুগত্যই চালিকাশক্তি বা প্রাণশক্তির ভূমিকা পালন করে।

হিটলার, মুসোলীনি আমাদের আদর্শ হতে পারে না। আমরা তবুও উদাহরণটি এজন্য আনলাম যে, ইসলামে আনুগত্য ও শৃঙ্খলার গুরুত্ব আরো অনেক বেশী। ইসলামের এই আনুগত্য ও শৃংখলাকে অনেকে আবার অবাস্তব অসম্ভবও মনে করতে চান। তাদের মনকে সন্দেহ সংশয় মুক্ত করার জন্যে ইসলামের বাইরেও যে এর গুরুত্ব স্বীকৃত এর বাস্তব পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন আছে।

ইসলামের বিজয়ের শুভ সংবাদ, বিশ্বজোড়া খেলাফতের ওয়াদা, আল্লাহর পক্ষ থেকে সুরায়ে নূরের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে। এই ওয়াদার আগে ঈমানদারদের যে পরিচয় দেয়া হচ্ছে তাতে আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা দেখাবার কথাই উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে মুমিনদের একমাত্র পরিচয় হল যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে কোন ফরমান শুনবার জন্য ডাকা হয় তখন তাদের মুখ থেকে মাত্র দুটি শব্দই উচ্চারিত হয় একটা হল, আমরা মনযোগ দিয়ে শুনলাম- দ্বিতীয়টা হল মাথা পেতে এ নির্দেশ মেনে নিলাম। এরূপ দ্বিধাহীন নির্ভেজাল আনুগত্যই সাফল্যের চাবিকাঠি।

আনুগত্যহীনতার পরিণাম ঃ

আল কোরআন ঘোষণা করেছে ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ.

হে ঈমানদারগণ। তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের অনুসরণ কর আর নিজেদের আমল বিনষ্ট করো না। মুহাম্মদ ৩৩

এই আয়াতের পূর্বাপর যোগসূত্র এবং নাযিলের পরিবেশের দৃষ্টিতে এর অর্থ দাঁড়ায় আনুগত্যহীনতা সমস্ত নেক আমলকে বরবাদ করে দেয়। নবী (সঃ)-এর পিছনে জামায়াতের সাথে নামায পড়েছে তারাই যখন যুদ্ধে যাবার নির্দেশ অমান্য করল, তাদের সমস্ত আমল ধুলায় মিশে গেল। আল্লাহ তাদেরকে মুনাফিক নামে ঘোষণা করলেন।

কোরআন পাকের আরও ঘোষণা ঃ

فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ.

অথচ তোমরা তাদের প্রতি রাজী ও সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ তো কিছুতেই ফাসেকদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না। আত তাওবা ঃ ৯৬

এ আয়াতের আলোকে বুঝা যাচ্ছে আনুগত্যহীনতার পরিণামে আল্লাহর রেজাবন্দী থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

কোরআন আরও ঘোষণা করে ঃ

وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.

যদি তোমরা রাসূলের আনুগত্য কর তাহলে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। আমার রাসূলের দায়িত্ব তো শুধু মাত্র দ্বীনের দাওয়াত সুস্পষ্টভাবে পৌছিয়ে দেয়া। আন নূর ঃ ৫৪

এই আয়াতে পরোক্ষ ইঙ্গিত রয়েছে- আনুগত্য প্রদর্শনে ব্যর্থ হলে হেদায়েত লাভের খোদা প্রদত্ত তৌফিক থেকে বঞ্চিত হবার আশংকা থাকে।

হাদীসে রাসূলে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. (رواه مسلم)

যে আনুগত্যের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায় এবং জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অতঃপর মৃত্যুবরণ করে, তার মৃত্যু হয় জাহেলিয়াতের মৃত্যু।

উক্ত হাদীসে প্রথমত: আনুগত্যহীনতাকে জামায়াত ত্যাগের শামিল বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত এর পরিণাম হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু।

আরও বলা হয়েছে ঃ

مَنْ كَرِهَ مِنْ اَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

যদি কেউ তার আমীরের মধ্যে অপছন্দনীয় কোন কাজ দেখতে পায় তাহলে যেন ছবর করে। (আনুগত্য পরিহার না করে) কেননা যে ইসলামী কর্তৃপক্ষের আনুগত্য থেকে এক বিঘত পরিমাণে সরে যায় বা বের হয়ে যায় তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু। (আল হাদীস)

উক্ত হাদীসে প্রথমত: আনুগত্যহীনতাকে জামায়াত ত্যাগের শামিল বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত: এর পরিণাম হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু।

আরও বলা হয়েছে ঃ

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِّنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَاحُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِىْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً. (مسلم)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) রাসূলে পাক (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন- তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আনুগত্যের বন্ধন থেকে হাত খুলে নেয়, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, নিজের আত্মপক্ষের সমর্থনে তাদের বলার কিছুই থাকবে না। আর যে ব্যক্তি বাইয়াত ছাড়া মারা যাবে তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু। (মুসলিম)

এ হাদীসেও আনুগত্য প্রদর্শনে অপারগতাকে বাইয়াতহীনতার শামিল বুঝানো হয়েছে- যার ফলে জাহেলিয়াতের মৃত্যু এবং আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে অক্ষম হওয়া।

দ্বীনি ও ঈমানী দৃষ্টিকোণ থেকে আনুগত্যহীনতার এই পরিণামের পাশাপাশি এর জাগতিক কুফল, শান্তি-শৃংখলাহীনতা, অরাজকতা, ঐক্য সংহতির বিঘ্ন হওয়া প্রভৃতির উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ আমাদেরকে আনুগত্যহীনতার এই উভয়বিধ কুফল থেকে হেফাজত করুন।

আনুগত্যের দাবী

আমরা দ্বীন ও ইসলামের সাথে আনুগত্য বা এতায়াতের যে সম্পর্ক দেখিয়েছি, তার আলোকেই বলতে হয়, ইসলামের বাঞ্ছিত আনুগত্য তাকেই বলা যাবে যেটা হবে মনের ষোলআনা ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে, পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা সহকারে, স্বতস্ফূর্ত প্রেরণা সহকারে। কোন প্রকারের কৃত্রিমতা বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংকোচ-সংশয়ের কোন ছাপ বা পরশ থাকতে পারবে না। এ আনুগত্য প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতা মাত্র হলে চলবে না। কোন নির্দেশ বা সিদ্ধান্তের আক্ষরিক দিকটাই কেবল বাস্তবায়ন করলে চলবে না, উক্ত নির্দেশ বা সিদ্ধান্তের অন্তর্নিহিত দাবী মন-মগজ দিয়ে উপলব্ধি করে নিষ্ঠার সাথে এবং সাধ্যমত সর্বোত্তম উপায়ে বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহর কোরআন এ প্রসঙ্গে ঘোষণা করেছে ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

আপনার রবের কসম তারা কখনও ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ, মামলা মুকাদ্দামার ব্যাপারে একমাত্র আপনাকেই ফয়সালা দানকারী হিসাবে গ্রহণ করবে, অতঃপর আপনার দেয়া সিদ্ধান্তের প্রতি তাদের মনে কোন দ্বিধা সংশয় থাকবে না এবং ঐ সিদ্ধান্ত সর্বোত্তম উপায়ে মাথা পেতে নেবে। (আন নিসা ৬৫)

মুনাফেকদের আনুগত্যের দাবী প্রসঙ্গে তাদের কৃত্রিমতা প্রসঙ্গে সুরায়ে নূরে আল্লাহ বলেছেন ঃ

قُلْ لاَ تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔

বলে দিন হে নবী, কসম খেয়ে আনুগত্য প্রমাণের তো কোন প্রয়োজন নেই। আনুগত্যের ব্যাপারটা তো খুবই পরিচিত ব্যাপার। সন্দেহ নেই, আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে অবগত আছেন। আন নূর ঃ ৫৩

আনুগত্যের পূর্বশর্ত ঃ

আল্লাহ তায়ালা আল কোরআনে এবং নবী (সাঃ) হাদীসে যত জায়গায় এ আয়াত উল্লেখ করেছেন, তার প্রায় সব জায়গাতেই এ আয়াতের আগে সামায়াত শব্দটা ব্যবহার করেছেন, যার শাব্দিক অর্থ হলো শোনা, শ্রবণ করা। বলা হয়েছে وَاسْمَعُوا وَاَطِيعُوا শোন এবং মান سمعنا واطعنا শুনলাম এবং মানলাম। যে হাদীসটির মাধ্যমে আমরা জামায়াতী জিন্দেগীর পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাই সেখানে বলা হয়েছে ঃ

"اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اَلْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيلِ اللّٰهِ ۔

এখানে এতায়াতের আগে সামায়াতের কথা বলা হয়েছে। এ থেকেও পরিষ্কার হয় যে, কোন নির্দেশ ও কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হলে সেই সিদ্ধান্তটা কি তা আগে ভালভাবে জানা এবং বুঝা দরকার। কোন কিছুর উপরে সঠিকভাবে আমলতো তখনই সম্ভব হবে যখন ব্যাপারটা সম্পর্কে এর গুরুত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হবে। শুধু নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত আক্ষরিকভাবে জানলেও যথেষ্ট হয় না। এর অন্তর্নিহিত দাবী এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। তাই কোন সিদ্ধান্ত তা মৌখিক হোক, অথবা লিখিত হোক, আসার সাথে সাথে মনোযোগ দিয়ে তা জানবার বা বুঝবার চেষ্টা করতে হবে, এর গুরুত্ব তাৎপর্যও হৃদয় দিয়ে উপলব্ধির চেষ্টা করতে হবে। কোথাও কোন ব্যাপারে অস্পষ্টতা থাকলে, বা বুঝে না আসলে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সাথে আলাপ আলোচনা করে অস্পষ্টতা দূর করে সঠিক বুঝ হাসিলের চেষ্টা করতে হয়। রাসূলের শিখানো দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنَا اتِّبَاعَهٗ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَّارْزُقْنَا اجْتِنَابَهٗ۔

হে আল্লাহ আমাদের হককে হক হিসাবে দেখান আর তৌফিক দেন তার অনুসরণ করার এবং বাতিলকেও বাতিল হিসাবে দেখান আর তৌফিক দেন তাকে বর্জন করার।

এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কি? হকের অনুসরণ করার জন্যে হককে হক হিসাবে চিনতে পারা অপরিহার্য। বাতিলকে বর্জন করতে হলে তেমনি বাতিল সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা জরুরী। এমনিভাবে যে কোন জিনিষের গ্রহণ বর্জনের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। কোন সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন এবং অনুসরণের ব্যাপারটা উক্ত সিদ্ধান্ত জানা বোঝা এবং এর গুরুত্ব ও পদ্ধতিগত জ্ঞানের উপরই নির্ভরশীল।

ওজর পেশ করা গুনাহ

ইসলাম আন্দোলনের সার কথা-এটা ঈমানের দাবী, নাজাতের উপায় এবং মুসলমানের প্রধানতম কর্তব্য। সুতরাং এই কর্তব্য পালনের পথ করে নেয়া বা সুযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করাই ব্যক্তির দায়িত্ব। এভাবে যারা সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়, আল্লাহ তাদেরকে সুযোগ করে দেন। আল্লাহ পাকের ঘোষণা রয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

যারা আমার রাস্তায় সংগ্রাম সাধনা করে, আমি তাদের পথ করে দেই। আল আন কাবুত ঃ ৬৯

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ۔

যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পথ করে দেন- এমন উপায়ে তার রিযেকের ব্যবস্থা করে দেন যে কল্পনাও করা যায় না। আততালাক ঃ ২, ৩

অভাব, অভিযোগ ও অসুবিধা প্রত্যেকের কিছু না কিছু থাকেই এবং যার, যার বিচারে নিজের সমস্যাই বড় করে দেখা মানুষের একটি প্রকৃতিগত

র্বলতা। ঈমানের দাবী হল এসব অভাব অভিযোগ বা অসুবিধা বাধা তিবন্ধকতাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা হিসাবে গ্রহণ করে এর অজুহাতে জ থেকে অব্যাহতি না চেয়ে বরং আরো বেশী বেশী করা। আল্লাহর কালামের ষণা ঃ

مَاأَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ

কোন বিপদ মছিবত আল্লাহর অনুমোদন বা নির্দেশ ছাড়া আসতে পারে না। রা আল্লাহর প্রতি সঠিক অর্থে ঈমান এনেছে তাদের দিলকে আল্লাহ হেদায়াত ন করেন। আত তাগাবুন ঃ ১১

অর্থাৎ তাদের দিল এ ব্যাপারে সঠিক বুঝ পেয়ে যায় এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বার সিদ্ধান্ত নেয়। এটা অজুহাত হিসাবে নিয়ে কাজ থেকে দূরে থাকার চিন্তা রে না।

আল কোরআনের ঘোষণায় এক পর্যায়ে এভাবে ওজর পেশ করে কোন নির্দেশ পালন থেকে অব্যাহতি চাওয়াকে ঈমানের পরিপন্থি হিসাবে উল্লেখ করা য়েছে। অন্যত্র অনুমতি প্রার্থনার সুযোগ দেয়া হয়েছে বটে কিন্তু আলোচনার রণ প্রকৃতি ভাল ভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করলে দেখা যায়, অনুমতি চাওয়াকে পছন্দ করা হয়েছে- এটা গুনাহর কাজ এই বলে সুক্ষ্মভাবে ইংগিতও দেয়া য়েছে যে ঃ-

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ.

যারা আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে, তারা কখনও আল্লাহর জানমাল দিয়ে জিহাদ করা থেকে আপনার কাছে অব্যাহতি চাবে না। সুরা তাওবা ঃ ৪৪

সুরায়ে নূরে কথাটা অন্যভাবে আনা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ

عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِ

نُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ

لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

মুমিন তো প্রকৃতপক্ষে তারাই যারা আল্লাহ ও রাসূলকে অন্তর থেকে মানে। আর যখন কোন সামষ্টিক কাজ উপলক্ষে রাসূলের সাথে থাকে, তখন অনুমতি না নিয়ে কোথাও যায় না। হে নবী, এভাবে যারা, আপনার কাছ থেকে অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ ও রাসূলকে মান্য করে চলে। অতএব তারা যখন কোন ব্যাপারে অনুমতি কামনা করে, তাহলে তাদের মধ্য থেকে যাকে চান অনুমতি দিতে পারেন এবং এরূপ লোকদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আন নূর ঃ ৬২

এখানে সূরা নূরের আয়াতটি মূলতঃ মুনাফিকদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যারা দায়িত্ব ও কর্তব্যে ফাঁকি দেয়ার মন-মানসিকতা নিয়ে অনুমতি চাইত। এই মন-মানসিকতা সহ ওজর পেশ ও অনুমতি অব্যাহতি কামনা আসলেই ঈমানের পরিপন্থি। সূরা নূরের কথাটা কোন মৌলিক সিদ্ধান্তের ওপর আমল করা থেকে অব্যাহতি কামনা নয় বরং কোন সামষ্টিক কার্যক্রম থাকা অবস্থায় সেখান থেকে সাময়িক প্রয়োজনে একটু এদিক ওদিক যাওয়া আসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এখানে জামায়াতী শৃঙ্খলার ব্যাপারটাই প্রধান। সে ক্ষেত্রেও লক্ষ্যণীয়, যারা কোন কারণে অনুমতি প্রার্থনা করবে তাদের সবাইকে অনুমতি দিতে বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে তাদের মধ্য থেকে যাদের আপনি অনুমতি দিতে চান। দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে দোয়া করবেন।

ওজর পেশের সঠিক পদ্ধতি হল, ব্যক্তি নিজে এই ওজরের কারণে কাজ না করার ফয়সালা নেবে না। বরং শুধু সমস্যাটা উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানাবে। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত যাই আসুক তাতেই কল্যাণ আছে এই আস্থা রাখবে।

আনুগত্যের পথে অন্তরায় কি কি ঃ

আনুগত্য প্রদর্শনে যারা ব্যর্থ হয়, তারা আত্মপক্ষ সমর্থনে অনেক অজুহাত পেশ করে থাকে। অনেক সুবিধা অসুবিধার কথা বলে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এগুলোর স্বীকৃতি দেন না। তার পক্ষ থেকে আনুগত্যহীনতার কারণ হিসাবে পরকালের জবাবদিহির অনুভূতির অভাব, আখেরাতের জীবনের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেবার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআন বলছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ.

হে ঈমানদার লোকেরা তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে বের হতে বলা হল আর তোমরা মাটি কামড়িয়ে পড়ে থাকলে? তোমরা কি আখেরাতের মুকাবিলায় দুনিয়ার জীবনকেই পছন্দ করে নিলে? যদি এমনই হয়ে থাকে তা হলে জেনে নিও দুনিয়ার এই সব বিষয় সামগ্রী আখেরাতের অতি তুচ্ছ ও নগন্য পাবে। আত তাওবা ঃ ৩৮

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ.

কখনও না, বরং প্রকৃত ব্যাপার হল তোমরা প্রতিফল দিবসের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ কর। ইনফিতার ঃ ৯

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا . وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى.

বরং তোমরা তো দুনিয়ার এই পার্থিব জীবনকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাক। অথচ আখেরাতের জীবনই উত্তম এবং স্থায়ী। আল আলা ১৬, ১৭

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ

তোমাদেরকে বেশী বেশী করে দুনিয়া ভোগ করার প্রবণতা এবং একে অপরকে এ ব্যাপারে ডিঙ্গিয়ে যাবার মানসিকতা গাফলতির মধ্যে নিমজ্জিত করে রেখেছে। আততাকাসুর ঃ ১

আল কোরআনের উল্লেখিত আয়াতসমূহের আলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আখেরাতের অনুভূতির অভাব এবং দুনিয়া পূজার মনোভাবই আনুগত্যহীনতার প্রধানতম কারণ। দ্বিতীয় পর্যায়ের কারণ হিসাবে আসে যার যার জায়গায় নিজ নিজ দায়িত্বের যথার্থ অনুভূতির অভাব। সেই সাথে বিভিন্ন কাজের বা সিদ্ধান্তের গুরুত্ব সম্পর্কে সঠিক চেতনার (Proper motivation) -এর অভাব। কাজটা হলে কি কি কল্যাণ বা লাভ হবে, না করলে কতটা ক্ষতি ব্যক্তির হবে, কতটা ক্ষতি আন্দোলন ও সংগঠনের হবে এই চেতনা ও উপলব্ধির অভাবও সাধারণভাবে আনুগত্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

উপরে বর্ণিত কারণ ছাড়াও কিছু মারাত্মক ও ক্ষতিকর কারণ রয়েছে যেগুলোর কারণে জেনে বুঝেও মানুষ আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয়।

এক ঃ গর্ব, অহংকার, আত্মপূজা ও আত্মম্ভরিতা।

গর্ব অহংকার মূলতঃ ইবলিসি চরিত্র। ইবলিস আল্লাহর হুকুম পালনে ব্যর্থ হল কেন?

আল্লাহ বলেন ঃ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ

সে হুকুম পালনে অস্বীকৃতি জানাল এবং অহঙ্কার প্রদর্শন করল।

আল বাকারা ঃ ৩৪

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ.

আল্লাহ কখনও অহংকারীকে পছন্দ করেন না। লুকমান ঃ ১৮

হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে- আল্লাহ বলেন ঃ অহংকার তো আমার চাদর (একমাত্র আমার জন্যেই শোভনীয়)। যে অহংকার করে সে প্রকৃতপক্ষে আমার চাদর নিয়েই টানাটানি করতে ব্যর্থ প্রয়াস পায়।

মানুষের দুর্বলতার এই ছিদ্র পথ পেয়ে ইবলিস সুযোগ গ্রহণ করে তার মনে আবার হাজারও প্রশ্ন তুলে দেয়- সিদ্ধান্ত কে দিল? হুকুম আবার কার মানব? আমি কি, আর সে কে? এ অবস্থায় মানুষের উচিত ইবলিসের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে আল্লাহর শরণাপন্ন হওয়া, তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। এটা একটা রোগ মনে করে, ইবলিসি প্রতারণা মনে করে কেউ যদি কাতর কণ্ঠে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় তাহলে আল্লাহ সে ফরিয়াদ শুনে থাকেন, তাঁর বিপন্ন বান্দাকে সাহায্য করে থাকেন। আল্লাহ পাকের ঘোষণা ঃ

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

যদি তোমরা শয়তানের পক্ষ থেকে কোন উস্কানি অনুভব কর, তাহলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা কর। তিনি তো অবশ্য সব কিছু শোনেন এবং জানেন। হা-মীম আস সাজদা ঃ ৩৬

দুই ঃ এই পর্যায়ের দ্বিতীয় কারণ হৃদয়ের বক্রতা যা সাধারণত সৃষ্টি হয়ে থাকে দায়িত্ব এড়ানোর কৌশল স্বরূপ নানারূপ জটিল কুটিল প্রশ্ন তোলার বা সৃষ্টির মাধ্যমে। মুসা (আঃ) -এর কওম সম্পর্কে আল্লাহ সুরায়ে সফে বলেছেন ঃ

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِىْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوْا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ .

মুসা (আঃ)-এর কথা স্মরণ কর যখন তিনি তার কওমকে লক্ষ্য করে বললেন, আমাকে তোমরা পীড়া দিচ্ছ কেন বা উৎপীড়ন করছ কেন? অথচ তোমরা তো জান যে, আমি আল্লাহর রাসুল। এর পরও যখন তারা বাঁকা পথে পা বাড়াল, আল্লাহ তাদের দিলকে বাঁকা করে দিলেন। - আস সাফ ঃ ৫

মুসা (আঃ) কে তারা উৎপীড়ন করতো কি ভাবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন নির্দেশ ফাঁকি দেবার, পাশ কাটাবার উদ্দেশ্যে আবোল তাবোল ও জটিল কুটিল প্রশ্নের অবতারণা করতো। আল্লাহ তায়ালা এটাকেই বাঁকা পথে চলা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আর এর পরিণামে সত্যি সত্যি আল্লাহ তাদের দিলকে বক্র করে দিয়েছেন- এভাবে নবীর ঈমানের ঘোষণা দেবার পরও ফাসেকদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে নিজেদের কর্ম দোষে।

আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মুহাম্মদীকে এই রোগ থেকে মুক্ত রাখার জন্যেই বনি ইসরাঈলের কীর্তিকলাপ ও তার পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করেছেন। সেই সাথে হেদায়াত লাভের পর হৃদয়ের বক্রতার শিকার হয়ে যাতে আবার গোমরাহীর শিকারে পরিণত না হয়। এ জন্যে দোয়া শিখিয়েছেন ঃ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ.

হে আমাদের রব, একবার হেদায়েত দানের পর তুমি আমাদের হৃদয়কে বাঁকা করে দিওনা। তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য খাস রহমত দান কর, তুমি তো অতিশয় দাতা ও দয়ালু। - আলে ইমরান ঃ ৮

তিন ঃ এই পর্যায়ের তৃতীয় কারণটি হল, অন্তরের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সংশয় সন্দেহের প্রবণতা। সাধারণত এই মানসিকতা জন্মলাভ করে লাভ-ক্ষতির জাগতিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও হিসাব নিকাশের প্রবণতা থেকেই আল কোরআনে সুরাতুল হাদীদের মাধ্যমে আখেরাতে ঈমানদার ও মুনাফিকদের সংলাপের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এই সত্যটাই ধরা পড়ে। আল্লাহ বলছেন ঃ

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ . يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِىُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ.

সেই দিন মুনাফিক নারী পুরুষদের অবস্থা এমন হবে যে, তারা মুমিনদেরকে ডেকে বলবে, একটু আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখ না। যাতে করে আমরা তোমাদের নূর থেকে একটু ফায়দা নিতে পারি। কিন্তু তাদের বলা হবে, পিছনে ভাগ। অন্য কোথাও নূর তালাশ করে দেখ। অতপর তাদের মাঝে একটা প্রাচীর দিয়ে আড়াল করে দেয়া হবে। যার একটা দরজা থাকবে। সেই দরজার ভেতরে থাকবে রহমত, আর বাইরে থাকবে আজাব. তারা (মুনাফিক)

মুমিনদেরকে ডেকে ডেকে বলবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? মুমিনরা উত্তরে বলবে, হ্যাঁ ছিলে তো বটেই, তবে তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ফেতনার শিকারে পরিণত করেছ। তোমরা ছিলে সুযোগ সন্ধানী, সুবিধাবাদী, তোমরা ছিলে সন্দেহ সংশয়ের শিকার। মিথ্যা আশার ছলনায় তোমরা ধোঁকা খেয়েছ। অবশেষে আল্লাহর শেষ সিদ্ধান্ত এসেই গেছে। আর সেই ধোঁকাবাজ (শয়তান) শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারেও ধোঁকায় ফেলে রাখতে সক্ষম হয়েছে।' আল হাদীদ ঃ ১৩, ১৪

উক্ত আয়াতের শেষের দিকের কথাগুলো সুযোগ সন্ধানী ও সুবিধাবাদী মন-মানসিকতা, সন্দেহ সংশয় এবং মিথ্যা আশার ছলনা এই তিনটি জিনিসই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় বস্তুবাদী চিন্তা থেকে লাভ ক্ষতির জাগতিক হিসাব নিকাশ থেকে। যা পরিণামে আনুগত্যহীনতার জন্ম দিয়ে থাকে।

আনুগত্যের পরিবেশ সৃষ্টির রূহানী উপকরণ ঃ

এই বিষয়টা বিশেষ করে দায়িত্বশীলদের জন্যে। কিন্তু সর্বস্তরের দায়িত্বশীল তো কর্মীদের মধ্য থেকেই এসে থাকে। তাছাড়া সংগঠনের বাইরের জনগোষ্ঠীর মাঝে আন্দোলনের প্রভাব বলয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাধারণ কর্মীরাও তো পরিচালনা বা নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে থাকে। কাজেই নেতা কর্মী সবার জন্যেই এটা প্রযোজ্য।

আনুগত্যের পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমার জানামতে তিনটি উপকরণকে রূহানী উপকরণ বলা যায়। অথবা এই তিনটিকে কেন্দ্র করে আনুগত্যের ক্ষেত্রে রূহানী পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

একঃ সর্ব পর্যায়ে দায়িত্বশীল ব্যক্তিগতভাবে এবং সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে। এ পথে উন্নতির জন্যে প্রতিনিয়ত আত্মসমালোচনার সাথে এ আনুগত্যের মান বাড়াবার চেষ্টা করবে।

দুইঃ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় বডির সিদ্ধান্তের প্রতি নিষ্ঠার সাথে শ্রদ্ধা পোষণ করবে। অত্যন্ত যত্নসহকারে তা বাস্তবায়নের প্রয়াস চালাবে। আর অধঃস্তন সংগঠনের নেতৃত্বের দায়িত্বে যারা থাকবে তাদের ঊর্ধ্বতন সংগঠনের, ঊর্ধ্বতন নেতার আনুগত্যের ব্যাপারে আদর্শ স্থাপনের প্রয়াস পেতে হবে।

তিনঃ যাদের সাথে নিয়ে সংগঠন পরিচালনা করা হচ্ছে, যাদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কামনা করা হয়, তাদের জন্যে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দোয়া করা অভ্যাসে পরিণত হতে হবে।

এছাড়া, নেতৃত্ব যারা দেবে বা সংগঠন যারা পরিচালনা করবে, তাদেরকে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কয়েকটি ব্যাপারে অগ্রগামী হতে হবে। নিজস্ব সহকর্মী সাথী সঙ্গীর গণ্ডি পেরিয়ে সাধারণ মানুষও তাদের এ অগ্রগামী ভূমিকা বাস্তবে উপলব্ধি করবে, এবং স্বত:স্ফূর্তভাবে তা স্বীকারও করবে।

(এক) ঈমানী শক্তি ও ঈমানের দাবী পূরণের ক্ষেত্রে

(দুই) ঈমানী শক্তি অর্জন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে

(তিন) আমল, আখলাক ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে

(চার) সাংগঠনিক যোগ্যতা ও দক্ষতার ক্ষেত্রে

(পাঁচ) মাঠে ময়দানের কর্মতৎপরতা ও ত্যাগ, কোরবানী ও ঝুকি নেবার ক্ষেত্রে

উল্লেখিত পাঁচটি ব্যাপারে কোন নেতা বা পরিচালক অগ্রগামী হলে তার প্রতি কর্মী তথা সাধারণ মানুষের মনে স্বত:স্ফূর্তভাবেই ভক্তি শ্রদ্ধা সৃষ্টি হতে বাধ্য। এ ভক্তিশ্রদ্ধার সাথে দ্বীনি আবেগজড়িত হওয়াটাও একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। নেতা এ পর্যায়ে পৌছতে পারলেই কর্মীরা তাকে প্রাণ ঢালা ভালবাসে, তার জন্যে প্রাণ খুলে দোয়া করে। তার কথায় সাড়া দিতে গিয়ে যে কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত হয় দ্বিধাহীনচিত্তে।

৯৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরামর্শ

আমরা সংগঠন প্রসঙ্গে আলোচনা করে এসেছি যে, আন্দোলন ও সংগঠনের প্রাণশক্তি হিসাবে কাজ করে দুটো জিনিস ঃ তার একটা হল পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করা, অপরটি হল সংশোধনের উদ্দেশ্যে গঠনমূলক সমালোচনা। শুরায়ী নেজাম ইসলামী সংগঠনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পরামর্শ দেয়া নেয়া বা পরামর্শের ভিত্তিতে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা এতো জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ হবার কারণ প্রথমত: এটা আল্লাহর নির্দেশ। নবী (সাঃ) অহীর মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছেন তবুও তাকে তাঁর সাথী সহকর্মীদের পরামর্শে শরীক করার প্রত্যক্ষ নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর নির্দেশ ঃ

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ

বিভিন্ন কার্যক্রমে তাদের পরামর্শ নাও, তাদের সাথে মতামত বিনিময় কর। আলে ইমরান ঃ ১৫৯

দ্বিতীয়ত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজে আল্লাহর নির্দেশের আলোকে সাহাবায়ে কেরামের সাথে বিভিন্ন ব্যাপারে পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তৃতীয়ত গোটা জামায়াতে সাহাবা (রাঃ) এর উপর আমল করেছেন। স্বয়ং আল্লাহ তার সাক্ষ্য পেশ করেছেন- আল কোরআন ঘোষণা করেছেন ঃ

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ

নিজেদের যাবতীয় সামগ্রীক ব্যাপারে নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে- আশ-শুরা ঃ ৩৮

উক্ত কথায় এটা বলা হয়নি যে, তাদের কাজ পরামর্শের ভিত্তিতে চলতে হবে, বরং এটা এসেছে একটা বাস্তব সত্যের বিবৃতি স্বরূপ। সাহাবায়ে কেরামের

জামায়াত তখন এ গুণের অধিকারী হয়েছিল। পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতেই তারা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন।

সাহাবায়ে কেরামের জামায়াতের মধ্য থেকে শীর্ষস্থানীয় হলেন খোলাফায়ে রাশেদীন। তারা ইসলামী খেলাফতের দায়িত্ব আনজাম দিতে গিয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণ করেছেন। তারা সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণ করেছেন সব বিষয়ে। মুসলমানদের সাথে পরামর্শের ব্যাপারটিও তার অন্যতম প্রধান বিষয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে তাই যে কোন ঐতিহাসিককেই স্বীকার করতে হয় যে, শুরায়ী নেজাম ছিল এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পরামর্শের গুরুত্ব সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস ঃ

اِذَا كَانَ اُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ وَاَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ وَاَمْرُكُمْ شُوْرٰى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ مِّنْ بَطْنِهَا وَاِذَا كَانَ اُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَاَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءُكُمْ وَاَمْرُكُمْ اِلٰى نِسَاءِكُمْ فَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا.

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের নেতারা হবেন ভাল মানুষ, ধনীরা হবেন দানশীল এবং তোমাদের কার্যক্রম চলবে পরামর্শের ভিত্তিতে তখন মাটির উপরের ভাগ নীচের ভাগ থেকে উত্তম হবে। আর যখন তোমাদের নেতারা হবে খারাপ লোক, ধনীরা হবে কৃপণ এবং নেতৃত্ব কর্তৃত্ব যাবে নারীদের হাতে তখন পৃথিবীর উপরের অংশের চেয়ে নীচের অংশ হবে উত্তম। (তিরমিযী)

يَقُوْلُ الرَّسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ بَايَعَ اَمِيْرًا عَنْ غَيْرِ مَشْوَرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَا بَيْعَةَ لَهُ وَلَا الَّذِىْ بَايَعَهُ.

(مسند احمد)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়াই আমীর হিসাবে বায়াত নেয় তার বায়াত বৈধ হবে না। আর যারা তার ইমারতের বায়াত গ্রহণ করবে তাদের বায়াতও বৈধ হবে না। (মুসনাদে আহমদ)

مَانَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ وَلَاخَابَ مَنِ اسْتَخَارَ

যে ব্যক্তি পরামর্শ নিয়ে কাজ করে তাকে কখনও লজ্জিত হতে হয় না। আর যে বা যারা ভেবে চিন্তে ইস্তেখারা করে কাজ করে তাকে ঠকতে হয় না।

اَلْمُسْتَشَارُ الْمُؤْتَمَنُ

যে পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করে সে নিরাপদে থাকে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে পরামর্শভিত্তিক কাজে দুটো বড় উপকারিতা আমরা দেখতে পাই ঃ

একঃ সাথী সহকর্মী মূলতঃ যারা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে মাঠে ময়দানে দায়িত্ব পালন করে থাকে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের পরামর্শ দেবার সুযোগ দিলে বা তাদের সাথে পরামর্শ করলে আনুগত্যের স্বতস্ফূর্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সাথী সহকর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব অনুভূতি বৃদ্ধি পায়। খোদানাখাস্তা কখনও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কোন প্রকারে অসুবিধা দেখা দিলে বিরূপ সমালোচনাও, অবাঞ্ছিত মন্তব্যের ক্ষতিকর পরিবেশ সৃষ্টি হবার কোনই সুযোগ থাকে না।

দুইঃ পরামর্শে অংশগ্রহণের ফলে কাজের গুরুত্বের উপলব্ধি স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। এ কারণে সাথী সহকর্মীদের মধ্যে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়, ফলে কাজে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বরকত যোগ হয়।

বদরের যুদ্ধের ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) আনসারদের সাথে যখন পরামর্শ করলেন তাদের উৎসাহের সীমা থাকল না। তারা স্বতস্ফূর্ত ভাবে ঘোষণা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি যদি বলেন সমুদ্রে ঝাপ দিতে আমরা বিনা দ্বিধায় তাতেও প্রস্তুত আছি। আমরা কওমে মুসার মত উক্তি করব না।

পরামর্শ কারা দেবে ঃ

পরামর্শের ক্ষেত্রে আমরা তিনটি পর্যায় ভাগ করতে পারি। (১) সর্ব সাধারণের পরামর্শ (২) দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের পরামর্শ (৩) আহলে রায় বা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ।

যে বিষয়ে যাদের সাথে সংশ্লিষ্ট অথবা যেখানে যাদের স্বার্থ ও অধিকার জড়িত, সেখানে তাদের সাথে আলোচনা বা পরামর্শ করতে হবে। যেমন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এনে যদি আমরা এ ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করি তাহলে এভাবে বুঝা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপ্রধান এবং রাষ্ট্রের পার্লামেন্ট গঠন ইত্যাদির সাথে সর্বসাধারণের স্বার্থ জড়িত, সুতরাং এখানে সর্বসাধারণের মতামত নেবার ব্যবস্থা করতে হবে। মতামত নেয়াটাই এখানে বড় কথা; প্রক্রিয়া, সময় সুযোগ ও অবস্থা বুঝে নির্ধারণ করা হবে। বাকি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণের আস্থাভাজন বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা পরামর্শ করলেই চলবে। কোন বিশেষ বিশেষ প্রকল্প ইত্যাদি প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে বিশেষ বিশেষ বিভাগের বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শই বাস্তব ভিত্তিক।

অনুরূপভাবে সংগঠনের আওতায় আমরা ব্যাপারটা সহজেই বুঝে নিতে পারি। যেখানে ক্যাডারভুক্ত সব লোকেরা জড়িত সেখানে ক্যাডারভুক্ত সব ব্যক্তির অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে। ক্যাডারের বাইরের লোকেরাও অনেক সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সে সব ব্যাপারে তাদের সাংগঠনিক অবস্থান সম্পর্কে কোন অস্পষ্টতা না রেখেও পরামর্শ দেয়া নেয়ার প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা যেতে পারে।

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল ইস্যুতে সংগঠনের বিশেষজ্ঞদের রায়ের প্রতি আস্থা রাখা যেতে পারে।

আন্দোলন এবং সংগঠনে পরামর্শের ব্যাপারটি বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের মধ্যেই বেশী জরুরী। দায়িত্বশীলদের মাঝে মন-খোলা পরামর্শের পরিবেশ না থাকলে একটা সংগঠনের আভ্যন্তরীণ সংহতিই থাকতে পারে না। কারণ মানুষ মাত্রই চিন্তাশীল। নিঃসন্দেহে দায়িত্বশীলগণ আরও বেশী চিন্তা করে থাকেন। চিন্তা তাদের মগজে এনে দেয় মাঠে ময়দানের অভিজ্ঞতা এবং চাহিদা। এভাবে দায়িত্বশীলগণের চিন্তার বিনিময় না হলে, ভাবের আদান প্রদান না হলে চিন্তার ঐক্য গড়ে উঠতে পারে না। অথচ চিন্তার ঐক্য ছাড়া সংগঠনের কোন সার্থকতাই থাকতে পারে না। হাদীসে দায়িত্বশীলদের পরামর্শের গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে -

اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِالْاَمِيْرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهٗ وَزِيْرًا صِدْقٍ اِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهٗ وَاِنْ ذَكَرَ اَعَانَهٗ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهٖ غَيْرَ ذَالِكَ جَعَلَ لَهٗ وَزِيْرَ سُوْءٍ اِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ وَاِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ. (ابوداؤد)

আল্লাহ যখন কোন আমীরের ভাল চান তাহলে তাঁর সত্যবাদী উজির নির্বাচিত করেন, আমীর কিছু ভুলে গেলে তিনি তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেন, আমীর কোন কাজ করতে চাইলে সে কাজে তাঁকে সহযোগিতা করেন। আল্লাহ যদি আমীরের অমঙ্গল চান তাহলে তার জন্য মিথ্যাবাদী উজির নিয়োগ করেন, তিনি কোন কাজ ভালভাবে তাকে স্মরণ করিয়ে দেন না, আমীর কোন কাজ করতে ইচ্ছা করলে তিনি সে কাজে তাঁর অসহযোগী হন - আবু দাউদ

পরামর্শ কিভাবে দিবে ঃ

পরামর্শ দেয়া অন্যান্য সংস্থা সংগঠনের একটা গঠনতান্ত্রিক অধিকার মাত্র। কিন্তু ইসলামী সমাজে ও সংগঠনে এটা নিছক অধিকার মাত্র নয়। এটা একটা পবিত্র আমানত। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্যে কোরআন সুন্নাহর আলোকে খোদার দেয়া বিবেক বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে বাস্তব কর্মকৌশল উদ্ভাবন ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা দান করা প্রত্যেকের দ্বীনি দায়িত্ব। কোন সময়ে কোন দিক থেকে ক্ষতির কিছুর আশংকা মনে হলে, সেই ক্ষতি থেকে সংগঠনকে রক্ষা করার জন্যে এ সম্পর্কে দায়িত্বশীলদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা একটা পবিত্র আমানত। ক্ষতির আশংকা মনে জাগল অথচ দায়িত্বশীলকে জানালাম না, কল্যাণ চিন্তা মগজে এল কিন্তু দায়িত্বশীলকে জানানো হল না তাহলে আল্লাহর দরবারে খেয়ানতকারী হিসেবে জবাবদিহি করতে হবে।

পরামর্শের এই দ্বীনি ঈমানী মর্যাদাকে সামনে রেখে আমার দায়িত্ব শুধু স্বতস্ফূর্তভাবে কোন পরামর্শ মনে এলেই দেয়া- তাই নয়। আন্দোলনে ও সংগঠনের উন্নতি অগ্রগতি সম্পর্কে সবাইকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। চিন্তাশক্তি ও বিবেক বুদ্ধির বিকাশ ঘটাবার চেষ্টাও করতে হবে যাতে করে সংগঠনকে ক্ষতিকর দিক থেকে হেফাজত করার ও কল্যাণ এবং অগ্রগতির দিকে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে বাস্তব সহযোগিতা দান করা সম্ভব হয়।

আন্দোলন ও সংগঠনের সার্বিক কল্যাণকে সামনে রেখে চিন্তা করতে হবে, পরামর্শ দিতে হবে ঠিকই কিন্তু ঐ ব্যাপারে সংগঠন নির্ধারিত নিয়ম পদ্ধতির বহির্ভূত কোন উপায় অবলম্বন করা যাবে না। নিজের মনের চিন্তা ও পরামর্শ প্রথমত নিজের নিকটস্থ দায়িত্বশীলের কাছেই ব্যক্ত করতে হবে। এরপর সংগঠনের দায়িত্বশীলদের বড়ির কাছেও বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ লিখিতভাবে পেশ করা যেতে পারে, পরামর্শ যিনি বা যারা দেবেন, তারা তাদের দিক থেকে চিন্তা ভাবনা করেই দেবেন। তাদের পরামর্শ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মনে করেই দেবেন। কিন্তু সেই সাথে তাদেরকে মনে রাখতে হবে, তার মত অন্যান্যদেরকে আল্লাহ তায়ালা চিন্তা করার মত বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন। সুতরাং তাঁরটাই গ্রহণ করতে হবে এই মন-মানসিকতা নিয়ে পরামর্শ দেয়া ঠিক হবে না। বরং পরামর্শ দাতার এতটা উন্মুক্ত থাকতে হবে, যে তার পরামর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তও যদি হয় তাহলে সে দ্বিধাহীনচিত্তে তা মেনে নেবে। তার মনের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে সে কোন মন্তব্যও করবে না।

মনে রাখতে হবে মানুষের পক্ষে মতামত কোরবানী দেয়াটাই বড় কোরবানী। মানুষ অনেক ত্যাগ কোরবানীর নজীর সৃষ্টির পরও মত কোরবানীর পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে যায়। অথচ জামায়াতী জিন্দেগীর জন্য এই কোরবানীই সবচেয়ে জরুরী। জামায়াতী ফয়সালার কাছে যে ব্যক্তিগত রায় বা মত কোরবানী করতে ব্যর্থ হয় সে তো প্রকৃতপক্ষে জামায়াতী জীবনযাপনেই ব্যর্থ হয়। পরিণামে এক সময়ে ছিটকে পড়ার আশংকা থাকে। আন্দোলন ও সংগঠনের অনেক দূর অগ্রসর হবার পরও যারা ছিটকে পড়ে তারা মূলত: এই ব্যর্থতার কারণেই ছিটকে পড়ে। তাই চিন্তা ভাবনা ও পরামর্শ উদ্ভাবনের মুহূর্তে সবাইকে জামায়াতী জিন্দেগীর এই চাহিদা এবং বাস্তবতাকে অবশ্যই সামনে রাখতে হবে। হাজার মতের, একশ মতের ভিত্তিতে কোন দিন আন্দোলন সংগঠন চলতে পারে না, সংগঠনকে একটা মতের উপর এসেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কাজেই শত শত হাজার হাজার কর্মী যার যার মতের উপর জিদ করলে বাস্তবে কি দশাটা দাঁড়ায় তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে না।

চিন্তার ঐক্যই আদর্শবাদী আন্দোলনের ভিত্তি এবং শক্তি। সুতরাং যথার্থ ফোরামের বাহিরে সংগঠনের ব্যক্তি তার পরামর্শকে মূল্যবান এবং অপরিহার্য মনে করে যত্রতত্র প্রচার করতে পারে না। তার স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টির কোন

প্রয়াসও চালাতে পারে না। কোন সংগঠনে এমন অনুমতি থাকলে সে সংগঠন চিন্তার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির শিকার হতে বাধ্য।

অহীর জ্ঞান ছাড়া আর কোন জ্ঞানকেই যেহেতু আমরা নির্ভুল মনে করি না সেই হিসাবে যদিও এটা বলা মুশকিল যে, সামষ্টিক সিদ্ধান্ত কখনও ভুল হয় না, সব সময়ই নির্ভুল হতে বাধ্য। কিন্তু এতটুকু বলতে দ্বিধা নেই- এতেই ভুলের আশঙ্কা থাকে সবচেয়ে কম। কাজেই ব্যক্তির মতামত নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে সামষ্টিক রায়ের কাছে নিজের রায় পরিহার করে নেয়াতেই সর্বাধিক কল্যাণ রয়েছে- সংগঠনের জনশক্তির মধ্যে এই মর্মে MOTIVATION হতে হবে।

সপ্তম অধ্যায়

সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনা

ব্যক্তি গঠনের জন্য আত্ম-সমালোচনা এবং সাংগঠনিক সুস্থতা, সংশোধন ও গতিশীলতার জন্য গঠনমূলক সমালোচনার সুযোগ থাকা অপরিহার্য। এই আত্ম-সমালোচনা ও সমালোচনা ইসলামের একটা পরিভাষা হিসাবে ইহতেসাব এবং মুহাসাবা নামেই পরিচিত। ইহতেসাব ও মুহাসাবা দুটোরই অর্থ হিসাব নেয়া। ইহতেসাব হিসাব আদায় করা। মুহাসাবা পরস্পরে একে অপরের হিসাব নেয়া। এই হিসাব নেয়া দেয়া বা আদায়টা প্রকৃতপক্ষে আখেরাতে আল্লাহর কাছে যে হিসাব দিতে হবে, তার পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমাদের ব্যক্তিগতভাবে সবাইকে আল্লাহর কাছে এই দুনিয়ার যাবতীয় কার্যক্রম, যাবতীয় দায় দায়িত্ব সম্পর্কে হিসেব দিতে হবে। সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করতে গিয়ে আমাদের পরস্পরের প্রতিও দায়িত্ব রয়েছে। অপর ভাইকেও সেই হিসাবের ব্যাপারে এই দুনিয়ায় থাকতেই সাহায্য সহযোগিতা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সেই সাথে আমাদের সামষ্টিক কার্যক্রমের ভালমন্দের দায়দায়িত্বও আমাদের বহন করতে হয়- সুতরাং ইহতেসাব ও মুহাসাবা আমাদের করতে হয় তিনটি পর্যায়ে ঃ

১। ব্যক্তিগত ইহতেসাব বা আত্মসমালোচনা, ২) সাথী ও বন্ধুদের একে অপরের মুহাসাবা, ৩) সামষ্টিক কার্যক্রমের মুহাসাবা বা পর্যালোচনা।

আমাদের তিন পর্যায়ের মুহাসাবাই আখেরাতের জবাবদিহি থেকে বাঁচবার লক্ষ্যে। সুতরাং তিন পর্যায়ের মুহাসাবার পদ্ধতি আলোচনার আগে আখেরাতের হিসাবের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূলের ঘোষণার সাথে একবার পরিচিত হওয়া যাক। কোরআন ঘোষণা করেছে

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ.

মানুষের হিসাব অতি নিকটে ঘনিয়ে আসছে অথচ তারা গাফলতির মধ্যে বিমুখ হয়ে পড়ে রয়েছে- আল আম্বিয়া ঃ ১

اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ.

সন্দেহ নেই তাদেরকে আমাদের কাছেই ফিরে আসতে হবে। অতঃপর আমাকে তাদের হিসাব নিতে হবে। আল গাশিয়াহ ঃ ২৫

اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ.

নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। আল ইমরান ঃ ১৯৯

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ.

যাদের প্রতি রাসূল পাঠান হয়েছিল আমি তাদের অবশ্য অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করে ছাড়বো। আর ঐ সব নবী-রাসূলগণকেও জিজ্ঞাসাবাদ করব। আল -আরাফ ঃ ৬

وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ.

অবশ্যই এই কিতাব আপনার জন্যে এবং আপনার কওমের জন্যে একটি স্মারক, আর আপনারা সবাই অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হবেন। আয যুখরুফ ঃ ৪৪

وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

তোমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুরা নাহাল ঃ ৯৩

হাদীসে রাসূলে বলা হয়েছে ঃ

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْاَمِيْرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْاَةُ رَعِيَّةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (متفق عليه)

তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই যার যার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হবে। দেশের শাসক একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, তাকে তার দেশবাসীর প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। একজন পুরুষ তার সংসারের দায়িত্বশীল, এই দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। স্ত্রী স্বামীর সংসারে সন্তানাদি দেখাশুনার জন্য দায়িত্বশীলা- তাকে তার ঐ দায়িত্বের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। জেনে রাখ তোমরা সবাই যার যার জায়গায় দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই এজন্য জবাবদিহি করতে হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

এক ঃ ব্যক্তিগত ইহতেসাব বা আত্ম-সমালোচনা ঃ

যে বা যারা ব্যক্তিগতভাবে ইহতেসাব বা আত্মসমালোচনা করে অভ্যস্ত নয় সে বা তারা অন্য ভাইয়ের ভুল সংশোধনের উদ্দেশ্যে বা সামষ্টিক কার্যক্রমের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ইনসাফপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে না। এই পর্যায়ের ইহতেসাবের ফলশ্রুতিতে ব্যক্তি নিজের ভুল ত্রুটিকে বড় করে দেখতে অভ্যস্ত হয় এবং অপরের ভুল ত্রুটিকে সে তুলনায় অনেক নগণ্য মনে করে। পক্ষান্তরে নিজের ভাল কাজগুলোর পরিবর্তে অপরের ভাল কাজগুলোকে বড় করে দেখার মন-মানসিকতার অধিকারী হয়। এভাবে অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার বা ছোট করে দেখার মানসিক ব্যাধি থেকে সে বা তারা নিজেদেরকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়।

ব্যক্তিগত ইহতেসাবের পদ্ধতি

এই ব্যক্তিগত পর্যায়ের ইহতেসাবও আমরা তিনভাবে করতে পারি ঃ (১) আনুষ্ঠানিকভাবে দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে। ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণ ও

পর্যালোচনার মুহূর্তটা সর্বোত্তম মুহূর্ত। দিনান্তের এই মুহূর্তটিতেই আমাদের কার্যক্রমের চিত্রটি বলে দেয়- আমরা কি করেছি, আর কি করতে পারিনি। এর অনিবার্য দাবী হল যা কিছু করতে পারিনি, করা সম্ভব হয়নি, সে জন্য অনুতপ্ত হওয়া, অনুশোচনা করা এবং আল্লাহর কাছে খালেস দিলে তওবা করে ভবিষ্যতের জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। আর কিছু করতে পেরেছি তার জন্যেও আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করে তার পছন্দনীয় কাজে আরও বেশী বেশী তৌফিক কামনা করা।

২) স্বতস্ফূর্তভাবে কোরআন এবং হাদীস পড়ার মুহূর্তে আত্মসমালোচনা বা আত্মজিজ্ঞাসার অভ্যাস গড়ে তোলা। সেই সাথে ইসলামী সাহিত্য পাঠের মুহূর্তে, দায়িত্বশীলদের হেদায়েতপূর্ণ ভাষণসমূহের মুহূর্তেও ঐভাবে আত্মসমালোচনার মাধ্যমে ব্যক্তির কি আছে কি নেই এর যথার্থ মূল্যায়ন করে নিজের জন্যে একটা কঠোর সংকল্পজনিত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কোরআন হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে আমাদের দায়িত্ব কর্তব্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আন্দোলন ও সংগঠনের প্রয়োজনে আমাদের যা কিছুই পড়াশুনা করতে হয় তাতে অবশ্য অবশ্যই কিছু জিনিস গ্রহণ করার এবং কিছু জিনিস বর্জন করার তাকিদ থাকে। যা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে তার কতটা আমি গ্রহণ করতে পেরেছি আর যা বর্জন করতে বলা হয়েছে তার কতটা আমি বর্জন করতে পেরেছি, এই জিজ্ঞাসাই আত্ম-জিজ্ঞাসা, এবং আত্মশুদ্ধি ও আত্মসংগঠনের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। একজন আন্দোলনের কর্মী যখন পড়বে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ. اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ.

নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ করেছে ঈমান গ্রহণকারী লোকেরা যারা নিজেদের নামাজে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে, যারা বেহুদা কাজ হতে দূরে থাকে, যারা যাকাতের পন্থায় কর্মতৎপর হয়, যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে, নিজেদের স্ত্রীদের ছাড়া এবং সেই মেয়েলোকদের ছাড়া যারা তাদের দক্ষিণ হস্তের মালিকানাধীন আছে। এই ক্ষেত্রে (হেফাযত না করা হলে) তারা ভৎর্সনাযোগ্য নয়। অবশ্য এদের ছাড়া অন্য কিছু চাইলে তারাই সীমালংঘনকারী হবে। যারা তাদের আমানত ও তাদের ওয়াদা-চুক্তির রক্ষণা বেক্ষণ করে এবং নিজেদের নামাযসমূহের পূর্ণ হেফাযত করে।' আল-মুমেনুন ঃ ১-৯

তখন তার মন স্বতস্ফূর্ত ভাবেই এ প্রশ্ন করতে থাকবে, আমি কি সেই সাফল্য মন্ডিতদের অন্তর্ভুক্ত? আমি কি নামাজে এভাবে বিনয়ী হয়ে থাকি? বেহুদা কাজ কারবার থেকে আমি কি এভাবে নিজেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম? আমি কি আত্মশুদ্ধির কাজে এভাবে নিয়োজিত? আমি কি এভাবে নিজের লজ্জা স্থানের হেফাযতে সক্ষম? আমি কি আমানত ও ওয়াদা রক্ষার ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত মানে আছি? নামাজ সমূহের দাবী সংরক্ষণে আমি কি যত্নবান? এমনিভাবে যখন পড়বে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ.

হে ঈমানদার লোকেরা। খুব বেশী ধারণা পোষণ হতে বিরত থাক, কেননা কোন কোন ধারণা পাপ হয়ে থাকে। তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখোঁজি কর না। আর তোমাদের কেহ যেন কারও গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? তোমরা নিজেরাইতো এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাক।'

হুজুরাত ঃ১২

তখন পাঠকের মন স্বতস্ফূর্তভাবেই বলে উঠবে। এই আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলা ও সিদ্ধান্ত নেয়ার রোগ ব্যাধি থেকে আমি কি মুক্ত? পরের ছিদ্রান্বেষণের প্রবণতা থেকে আমার মন মগজ কি মুক্ত? অপরের নিন্দা চর্চার

সর্বনাশা মানসিক ব্যাধি থেকে আমি কি আমার মন মগজকে সুস্থ রাখতে সক্ষম?

এভাবে হাদীসে রাসূল পড়া কালে যখন তার সামনে আসবে মুমিনের বিশেষ গুণাবলীর বর্ণনা। কবিরা গুনা সমূহের আলোচনা, মুনাফিকের আলামত প্রভৃতি- যখন তার মনকে সে জিজ্ঞাসা করবে, মুমিনের বাঞ্ছিত গুণাবলী থেকে তুমি কতটা দূরে অবস্থান করছ- কবিরা গুনাহের কোনকোনটা এখনও তোমার থেকে বিদায় নেয়নি। মুনাফিকের কোনকোন আলামত এখনও তোমার মাঝে বিদ্যমান? এই ভাবে কোরআন ও হাদীস চর্চার মুহূর্তে নিজের খতিয়ান নেওয়াকেই আমরা স্বতস্ফূর্ত ইহতেসাব বলতে পারি। এ ধরনের মনোভাব নফল নামায, বিশেষ করে তাহাজ্জুদের নামাযের মুহূর্তেও সৃষ্টি হতে পারে। শেষ রাতের নীরব নিস্তব্ধ মুহূর্তে নিজের কানকে শুনাবার মত নিয়ন্ত্রিত আওয়াজ তারতিলের সাথে আখেরাতের আলোচনায় ভরপুর সুরা বা আয়াতসমূহের তেলাওয়াত-আল কোরআন এবং হাদীসে রাসূলে উল্লেখিত ভাষায় দোয়া ও মুনাজাত আল্লাহর বান্দাকে তার সান্নিধ্যে নিয়ে যায়, সত্যিকারের তওবা ও আত্মোপলব্ধির এটাই সর্বোত্তম মুহূর্ত যা কেবল হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা যেতে পারে- ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

(৩) বাস্তব কর্মক্ষেত্রে কোথাও কোন ভুল ত্রুটি হয়ে গেলে সাথে সাথে তা সুধাবার উদ্যোগ নেয়া। যারা নিয়মিত আত্মসমালোচনা করে অভ্যস্ত তাদের কাজে কর্মে কোন ভুলত্রুটি হলে তা সাথে সাথেই ধরা পড়বে। তখন এই ভুল চাপা না দিয়ে বা নির্ধারিত সময়ের আত্মসমালোচনার জন্যে রেখে না দিয়ে সাথে সাথে সংশোধনের প্রয়াস পাওয়া দরকার। এই ভুল কাজ-কর্মে হতে পারে। সহকর্মীদের সাথে কোন দুর্ব্যবহার হয়ে গেলে অন্য কারো চাপে ত্রুটি স্বীকারের চেয়ে মনের তাগিদে স্বতস্ফূর্তভাবেই নিজে নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেবে।

দুই ঃ পারস্পরিক মুহাসাবা

এক মুমিন আর এক মুমিনের ভাই, তারা পরস্পরে এক অপরের শক্তি যোগায়। দ্বীনের আসল দাবী শুভ কামনা- আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বতের দাবীকে সামনে রেখে মুসলমানদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এবং সর্বসাধারণের শুভ কামনা করা। এই স্পিরিটকে সামনে রেখেই পরস্পরের ভুলত্রুটি

শোধরাবার আন্তরিক প্রচেষ্টাই পারস্পরিক মুহাসাবা নামে অভিহিত। এখানে সংশোধন কামনা, নিজের ভাইকে দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা, উন্নতি ও কল্যাণের পথে চলতে সাহায্য করাই মুখ্য। যার অনিবার্য দাবী হল, নিজের মনকে সবার কল্যাণ কামনায় ভরপুর রাখতে হবে। মনে সবার জন্য অকৃত্রিম দরদের অনুভূতি থাকতে হবে। সবার উন্নতি অগ্রগতির কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া ও মুনাজাতের অভ্যাস থাকতে হবে। ভাইদের সামগ্রিক তৎপরতা ও চরিত্রের ভাল ভাল দিকগুলোর যথার্থ স্বীকৃতি থাকতে হবে। এ কারণে তারা যতটা শ্রদ্ধাবোধের দাবী রাখে নিজের মনে ততটা শ্রদ্ধাবোধ অবশ্যই রাখতে হবে। তাহলেই মুহাসাবা করার মুহূর্তে ইনসাফ করা এবং সীমালংঘনের মত দুর্বলতা থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। এই পারস্পরিক মুহাসাবাকেও আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি। (১) দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে কর্মীদের বা অধস্তন দায়িত্বশীলদের মুহাসাবা। (২) কর্মীদের বা অধস্তন দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে কর্মীদের বা অধস্তন দায়িত্বশীলদের মুহাসাবা (৩) কর্মীদের বা অধস্তন দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলদের বা অধস্তন দায়িত্বশীলদের মুহাসাবা। (৪) কর্মীদের পরস্পরের, একে অপরের মুহাসাবা।

যেহেতু সব ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে ভাইয়ের সংশোধনই প্রকৃত লক্ষ্য। সুতরাং নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

(১) এ ধরনের মুহাসাবার জন্যে একটা অন্তরঙ্গ পরিবেশ প্রয়োজন। সর্বাগ্রে সেই পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস পেতে হবে।

(২) ভাইয়ের বা সাথী সহকর্মীর যেসব ত্রুটি বিচ্যুতির মুহাসাবা করতে চাই সেগুলো তার মধ্যে আছেই এমন ভাষায় তা ব্যক্ত করা ঠিক হবে না। বরং আমার কাছে এমন মনে হচ্ছে। হতে পারে আমি ভুল বুঝেছি। আসল ব্যাপারটা আপনার কাছ থেকে জেনে আমি আমার মনকে পরিষ্কার রাখতে চাই- এ ধরনের ভাষায়ই কথাগুলো উপস্থাপন করা উচিত। এটা নিছক একটা অভিনয় নয়। বাস্তবেও এমনি হতে পারে। কাজেই প্রথমে ব্যক্তির কাছ থেকে প্রকৃত অবস্থা জানাটাই অপরিহার্য। এভাবে ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে তার নিজস্ব বক্তব্য শুনার পর যদি সত্যি-সত্যি মনে হয় যে, আমার ধারণা ঠিক ছিল না। তাহলে আর অগ্রসর না হয়ে নিজের মনকে ভাই সম্পর্কে পরিষ্কার করে নেয়া দরকার।

আর যদি তার বক্তব্যের পরও এ ধারণা থেকেই যায় যে, তার মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতি বাস্তবেই বিরাজমান, তাহলে দরদপূর্ণ ভাষায় তাকে নছিহত করতে হবে। যদি এই নছিহত গ্রহণের জন্যে এই মুহূর্তে তাকে প্রস্তুত মনে না হয়, তাহলে উপযুক্ত কোন সময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে তার জন্যে আল্লাহর কাছে বেশী বেশী দোয়া করতে হবে। অন্যদিকে উপযুক্ত সময় সৃষ্টি করে নেয়ার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে হবে।

অপরদিকে যার মুহাসাবা করা হয়, তাকে ভাইয়ের দরদপূর্ণ উদ্যোগকে স্বতস্ফূর্তভাবে শ্রদ্ধা জানাতে হবে। নিজের দোষ-ত্রুটি অনেক সময়ই নিজের চোখে ধরা পড়ে না। তাই ভাইয়ের এই পদক্ষেপকে নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে এবং ভাষার জোরে, যুক্তির জোরে, নিজেকে দোষমুক্ত প্রমাণ করার কোন কৃত্রিম উপায়ের আশ্রয় না নিয়ে বরং ভুলত্রুটি স্বীকৃতি দিয়ে সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেবে এবং এ ব্যাপারে ভাইয়ের আন্তরিক সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করবে। এ ব্যাপারে মুহাসাবাকারী ও মুহাসাবাকৃত ব্যক্তি যার যার জায়গায় বাঞ্ছিত ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হলে সত্যি এক স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে মানুষের সংগঠনের অভ্যন্তরে।

মুহাসাবা বা সমালোচনা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে সাধারণ কর্মীদের জন্যে শিক্ষণীয় ও অনুসরণীয় উদাহরণ সৃষ্টি হবার প্রয়োজন আছে। কারণ তাত্ত্বিক আলোচনায় এটাকে আমরা যত সহজভাবে পেশ করতে পারি, বাস্তবে কিন্তু এটা তত সহজ ব্যাপার নয়। সমালোচনা সহ্য করার মত, নিজের ভুলত্রুটি স্বীকার করার মত সৎ সাহসী লোকের আসলেই অভাব আছে। এ অভাব দূর করতে হলে কিছু ব্যক্তিকে নমুনা হিসাবে সামনে আসার প্রয়োজন আছে। আর এই নমুনা পেশ করতে হবে বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরকেই।

ঐসব দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা খুবই ভাগ্যবান, যাদের সাথী বন্ধুরা নিঃসংকোচে নির্দ্বিধায় তাদের দায়িত্বশীলদের ভুলত্রুটি শোধরাবার প্রয়াস পায়। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সংশোধন ও উন্নতি কামনা করে এবং বাস্তবে তা কার্যকর করার সুযোগ পায়। পক্ষান্তরে চরম দুর্ভাগ্য ঐসব নেতা ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ, যাদের সাথী ও সহকর্মীগণ তাদের মধ্যে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ্য করে, মনে মনে বিক্ষুব্ধ হয়ে থাকে, তাদের মনের ক্ষোভ ভেতরে

ভেতরে গুমরে মরে, অথচ নেতা বা দায়িত্বশীলদের আচরণের কারণে তারা তা প্রকাশ করতে সাহস পায় না বা প্রকাশ করতে চায় না। এমন পরিবেশ ইসলামী আন্দোলনের জন্যে একান্তই অবাঞ্ছিত।

এভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে, অন্তরঙ্গ পরিবেশে আলাপ আলোচনা চালালে শতকরা ৯৫% ভাগ ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া যায়। সুতরাং ব্যাপারটা অন্যত্র নেবার কোন প্রয়োজনই দেখা দেয় না। কিন্তু যদি এই উদ্যোগ ব্যর্থ হয় তাহলে পর্যায়ক্রমে যথাযথভাবে দায়িত্বশীল ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তির অনুমতি ক্রমে কোন সমষ্টিক পরিবেশেও এটা উপস্থাপন করা যেতে পারে যাতে করে অন্যান্য ভাইদের নছিহতপূর্ণ সামষ্টিক বক্তব্যে তার মনে কোন পরিবর্তন এসে যেতে পারে। মনে রাখতে হবে এর বাইরে কোন ভাইদের বাস্তব দোষ ত্রুটির আলোচনাও শরীয়তের দৃষ্টিতে গীবত। যা থেকে বাঁচার চেষ্টা করা ব্যক্তির আখেরাতের স্বার্থে, আন্দোলন ও সংগঠনের স্বার্থে একান্তই অপরিহার্য। পারস্পরিক মুহাসাবার ক্ষেত্রে হাদিসে রাসূলের উপমাটি প্রণিধানযোগ্য। হাদীসে এক মুমিনকে অপর মুমিনের জন্য আয়নাস্বরূপ বলা হয়েছে। আয়নার ভূমিকা কি? (১) আমার চেহারায় কোথায় কি আছে আমি দেখতে পাই না, আয়না আমাকে দেখিয়ে দেয়। (২) এই দেখবার ক্ষেত্রে আয়না তার নিজের দিক থেকে কিছুই বাড়িয়ে বা অতিরঞ্জিত করে দেখায় না। আবার কমও দেখায় না। (৩) আমি যতক্ষণ আয়নার সামনে থাকি ততক্ষণই সে আমার দোষ ত্রুটি আমাকে দেখায়। আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে সে এটা দেখায় না বা বলাবলি করে না। অনরূপভাবে আমার নিজের ত্রুটি বিচ্যুতি জানবার জন্য অন্য ভাইকে একটা উত্তম অবলম্বন মনে করব। এই ত্রুটি দেখাতে গিয়ে আমরা বাড়াবাড়ি করব না। সর্বত্র এই নিয়ম নীতির অনুসরণের মাধ্যমেই আমরা সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যের সুদৃঢ় বন্ধন গড়ে তুলে আল্লাহর ভালবাসার পাত্র হতে পারি।

তিন ঃ সাংগঠনিক কাজের মুহাসাবা ঃ

সাংগঠনিক কাজে গতিশীলতা আনার জন্য সুস্থতার সাথে সংগঠন পরিচালনার জন্যে, যেমন সর্বস্তরের জনশক্তির পরামর্শের প্রয়োজন আছে, তেমনি সবার মুহাসাবার সুযোগও বাঞ্ছনীয়। পরামর্শ যেমন যত্রতত্র, যেন তেন প্রকারের দেয়া ঠিক নয়। মুহাসাবাও তেমনি যত্রতত্র যে ভাবে সেভাবে হতে

পারে না। গঠনমূলক সমালোচনা যেমন আন্দোলনকে ৬
থাকে- লাগামছাড়া সমালোচনা আবার তেমনই একটা
আত্মঘাতী প্রমাণিত হয়ে থাকে।

সাংগঠনিক মুহাসাবার উপায়ঃ

স্থানীয় সংগঠনের মুহাসাবা একদিকে ঊর্ধ্বতন সংগঠনের প
থাকে। অপর দিকে এর সাথে সংশ্লিষ্ট জনশক্তির পক্ষ থেকে হয়ে
জনশক্তির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ হয় ব্যক্তিগত আলোচনার ম
লিখিতভাবে দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে সাংগঠনিক কার্যক্রমের ব্য
পর্যালোচনা পৌছাবে অথবা পর্যালোচনা বা মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে
কোন অনুষ্ঠানে তার বক্তব্য পেশ করবে। কিন্তু নিজের মূল্যায়ন ও
পর্যালোচনাকেই সে একমাত্র নির্ভুল বা সঠিক পর্যালোচনা বা মূল্যায়ন মনে করবে না। সামষ্টিক পর্যালোচনা ও মূল্যায়নকে দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করার জন্যে তাকে সর্বাবস্থায় প্রস্তুত থাকতে হবে।

ঊর্ধ্বতন সংগঠনের কার্যক্রম প্রসঙ্গে নিজের মনোভাব বা মূল্যায়ন সম্পর্কে ঊর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দকে নিজ নিজ এলাকার প্রতিনিধির মাধ্যমে ওয়াকেফহাল করার চেষ্টাই সর্বোত্তম পন্থা। কেউ চাইলে সরাসরি ওয়াকেফহাল করতে পারে। ঊর্ধ্বতন সংগঠনের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের যথার্থ ফোরাম কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা এবং সদস্য সম্মেলন জনশক্তির বাকী অংশের মতামত এদের মাধ্যমে জানতে হবে এবং এদের ফোরামের গৃহীত পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও মতামতকেই দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করার জন্যে মন- মেজাজকে সদা উন্মুক্ত রাখতে হবে। এর ব্যতিক্রম আচরণ পরিবেশকে দূষিত করে। আন্দোলন ও সংগঠনের সর্বস্তরের জনশক্তিকে এ ব্যাপারে সজাগ সচেতন স্বতন্ত্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করতে হবে।

সমাপ্ত